পাইলট্ শিলু

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

নাথ ব্রাদার্স
২৩-সি, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

গোড়ার কথা

শিলু যেদিন আমার পড়ার ঘরে এসে হঠাৎ বল্‌লে—"আমার হার্ট ষ্ট্রং হবে কি ক'রে খালিদাদা? আমি পাইলট্‌ হবো," সেদিন আমি ভাব্‌তেই পারিনি যে, সেই শিলুকে নিয়ে আজ এমন হৈ চৈ পড়ে যাবে।

যখন শিলু ছোট্টটি ছিল, তখন আমাকে ডাক্‌ত দাদামণি বলে। আমি একদিন বলেছিলাম, 'ছ্যাখ্‌ দাদামণি বল্‌বি না, খালি দাদা বলে ডাক্‌বি।' ও হয় ত' ঠিক বুঝ্‌তে পারেনি,

কিংবা বরাবরই ভয়ানক দুষ্টু বলে, সেই থেকে আমাকে ডাক্‌তে লাগ্‌ল খালিদাদা বলে, আর আজ পর্য্যন্ত তাই বলেই ডাকে।

কেমন করে হার্ট ষ্ট্রং হবে সে উপায় শিলু যখন আমার কাছে জান্‌তে এসেছিল, তখন সে তিন ফুটের বেশী উঁচু ছিল না, আর আমি ছিলাম তার চেয়ে অনেক বড়। তখন শিলুর প্রশ্ন শুনে তাই বোধ হয় হেসেছিলাম—এই ভেবে যে, তিন-ফুটের শিলু আবার পাইলট্ হবে! কিন্তু এখন শিলুর জুতোর গোড়ালি থেকে আরম্ভ করে টেরির ডগা পর্য্যন্ত, পাঁচ ফুট এগার ইঞ্চি; আর আমি যা ছিলাম তাই আছি। শিলুর কাঁধ পর্য্যন্ত আমার মাথাই পৌঁছায় না, তাই আর এখন ঠাট্টা কর্‌তে সাহস হয় না ওকে।

এ সব ত গেল একেবারে গোড়ার কথা। পাইলট্ হ'তে সখ শিলুর ছোট বেলা থেকেই ছিল বলে শেষে শিলু পাইলট্‌ই হল, আর হার্ট-ও তার ষ্ট্রং হল খুবই। ছোটবেলা থেকে যদি কোনও সখ থাকে তাহলে শেষে সেটা পূর্ণ হয়েই যায়, এই নিয়ম কি না।

উনিশ বছর বয়সে শিলু যখন 'এ' পাইলট্ হয়ে নিজের একটা এরোপ্লেন কিনে ফেলে তাম্‌তিরাম বলে একটা চাকর বাহাল করে ফেল্‌লে, তখনও ভালো করে তার গোঁফের রেখা

ওঠে নি। কিন্তু সত্যি, আমার বড় বড় গোঁফ থাকা সত্ত্বেও আমি এইবার ওকে একটু সম্ভ্রম করতে আরম্ভ করলাম। উনিশ বছর বয়সেই শিলু পাইলট্, আর তা-ও আবার নিজের একটা এরোপ্লেন, আর আমি কিনা এখন পর্য্যন্ত একদিনও এরোপ্লেনে উড়লাম না!

অথচ এই শিলু একদিন একেবারে কি ছেলেমানুষ-ই না ছিল। যখন তার বয়স মাত্র আট কি নয়, একদিন আমাদের বাড়ী ছোট্ট একটা ফুটফুটে খুকী বেড়াতে এসেছিল তার বাবার সঙ্গে। তাকে দেখতে ঠিক যেন প্রকাণ্ড একটা সেলুলয়েডের পুতুল। তেম্নি টুক্‌টুকে মুখ, ছোট্ট কচি কচি হাত পা, ফুর্‌ফুরে কটা চুল আর মাত্র কয়েকটা দাঁত। ফ্রক্-পরা সেই খুকু অন্দর মহলে গিয়ে অপরিচিত লোকদের মাঝখানে পড়ে কেঁদে ফেলে-ছিল। শিলুই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল তাকে, তাই বোধ হয় অন্যের চেয়ে তবু একটুখানি চেনা মনে করে খুকী শিলুকে জড়িয়ে ধরেছিল, কিছুতেই ছাড়তে চায়নি। এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে শিলুর বৌদি সেদিন শিলুকে খুব ঠাট্টা করেছিল; দুষ্টুমী করে খুকুর নাম রেখে দিয়েছিল হাস্না, আর শিলুকে চটাবার জন্য খালি বল্‌ত যে হাস্নার সঙ্গে শিলুর বিয়ে হবে।

পাইলট্ হয়ে শিলু যখন এরোপ্লেন কিনে ফেল্‌লে, তখন আর এ সব কথা তার মনে ছিল না, এমন কি বৌদিও বোধ হয়

ভুলে গিয়েছিলেন। নিজের এরোপ্লেনের নাম শিলু রাখ্‌লে 'মৌমাছি।' আমি যদিও কোন দিন এরোপ্লেনে চড়িনি, তবু কোন্ ধরণের এরোপ্লেন দেখতে ভালো, তা' ত' জানি! মৌমাছির মতন সুন্দর এরোপ্লেন খুব কমই তৈরী হয়। যদিও এতে মাত্র তিন জনার বস্‌বার জায়গা, আর আমাদের বাড়ীতে ছেলে বুড়ো সব নিয়ে অন্ততঃ তেত্রিশ জন—তবু যে দেখ্‌ত তারই সাধ হ'ত চড়ে একটুখানি উড়ে বেড়াতে।

আসল গল্পটা কিন্তু এখনও আরম্ভ হয় নি, আরম্ভ হল যখন আমাদের শিলং যেতে আর দেরী নাই। টিকিট কেনা, গাড়ী রিসার্ভ, লোক পাঠান, সব শেষ। যেতে যখন আর মাত্র একদিন বাকী, শিলু সকাল বেলা চা খেতে খেতে বল্‌লে যে শিলং সে যাবে উড়ে, শুধু এক তাম্‌তিরাম্‌কে সঙ্গে নিয়ে। প্রথমে ভাব্‌লাম যে শিলু বুঝি ঠাট্টা কর্‌ছে, কিন্তু সে সোজা বলে দিলে যে, যদি এরোপ্লেনে তাকে না যেতে দেওয়া হয়, তাহ'লে সে যাবেই না। কাজেই রাজী হওয়া ছাড়া আমরা আর কি কর্‌তে পারি?

ঠিক হল আমরা রওনা হবার পর শিলু মৌমাছি নিয়ে রওনা হবে, আর আমাদের আগে শিলং পৌঁছে সেখানে সব বন্দোবস্ত করে রাখ্‌বে আমাদের জন্যে।

সকাল বেলা আমিন্‌গাঁও ষ্টেশনে ষ্টীমারে উঠে চা খাচ্ছি,

এমন সময় একটা টেলিগ্রাম পেলাম। শিলুর টেলিগ্রাম, "সকাল সাতটায় রওনা হচ্ছি।"

ঠিক বারোটা বেজে দশ মিনিটে প্রবল বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে আমরা মড়ার মাথা আর হাড়ের ছবি আঁকা ফটক পার হয়ে শিলং সহরে ঢুকলাম। সারা রাস্তা মোটরে ভাবতে ভাবতে এসেছি, শিলু আর তাম্‌তি আমাদের জন্যে এতক্ষণ চানের জল আর ধূমায়মান ভাত ঠিক করে রেখেছে।

বাড়ী আস্‌তেই বৃষ্টিটা আরও চেপে এল। কোনও রকমে তাড়াতাড়ি বারান্দায় উঠে ডাক দিলাম 'শিলু, এই শিলু! তাম্‌তি!' কেউ সাড়া দিলে না, যে ভীষণ বৃষ্টি, বোধ হয় শুন্‌তেই পেলে না। আরও জোরে ডাক্‌লাম, তবু কোনও সাড়া নেই; পাঁতি-পাঁতি করে সমস্ত ঘর খুঁজলাম, কিন্তু শিলু কিংবা তাম্‌তি কারও দেখা নেই। শিলং আসার সব আনন্দ এক নিমেষে উবে গেল। মার মুখ আশঙ্কায় ম্লান হয়ে এল, শিলুর বৌদি শুধু কাঁদতে বাকী রাখ্‌লে।

গেল কোথায় শিলুরা? এই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে দিক্ ভুল করে যদি অন্য কোথাও গিয়ে পড়ে থাকে এই পাহাড়ে দেশে—ভাব্‌তেই শিউরে উঠ্‌লাম। সকালে শিলুর তার পেয়েছি—সাতটায় রওনা হচ্ছি। হয়ত রওনা হয়ই নি! কিন্তু বারবার মনে হতে লাগ্‌ল, 'আর যদিই হয়ে থাকে!'

জলের মধ্যে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে গিয়ে ক'লকাতায় জরুরী তার করে দিয়ে এলাম। বিকেলে যখন উত্তর এল, এতক্ষণ বাড়ীতে গুম্‌রে গুম্‌রে যারা কাঁদছিল, সকলে মিলে ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তে আরম্ভ করে দিলে। ক'লকাতার তারের খবর—শিলু বাবু সাড়ে ছ'টায় উড়ে গিয়েছেন।

মৌমাছি—ঘণ্টায় একশ'বারো মাইল করে স্বচ্ছন্দে যে উড়ে যেতে পারে, ক'লকাতা থেকে শিলং—মাত্র শ' পাঁচেক মাইল আস্‌তে তার কতক্ষণ লাগে? 'এ' পাইলট্ শিলু, দম্‌দম্ এরোড্রোমেও যার মতন পাকা পাইলট্ খুব কম, প্রবীণ, বিচক্ষণ পাইলটেরাও যার সুখ্যাতি করেন, সেই শিলুর সহজে দিক্ ভ্রম হবার কথা নয়।

সেদিন আর কিছুই করা গেল না। পরদিন সকাল থেকেই খোঁজ কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম, কিন্তু একেবারে ব্যর্থ হল সব খোঁজা। শিলুর কিংবা মৌমাছির কোনও সন্ধান কেউ দিতে পার্‌লে না। বহু খাশিয়াদের ডেকে প্রশ্ন করা হল, পুরস্কার দেব বল্লাম, কিন্তু কোথাও কোনও খবর পেলাম না।

এর পরে আর কোনই সন্দেহ থাকল না যে, শিলু, তাম্‌তি আর মৌমাছি পাহাড়ে ধাক্কা লেগে সব গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে! কয়েকদিন যে আমাদের কেমন করে কাট্‌ল, আমরাই জানি! বাড়ীর মেয়েরা কেউ আর থাক্‌তে রাজী হল না

শিলঙে—কাঁদতে কাঁদতে সবাইকে নিয়ে ক'লকাতা ফিরে এলাম।

কথায় বলে সময়ে সবই সয়। চোখের জল মুছে সবাই আবার নিজের নিজের কাজে লেগে গেল, কিন্তু সমস্ত বাড়ীটা হয়ে থাকল নীরব, নিঝুম। মুখের হাসি সবারই ঘুচে গেল একেবারে।

শিলং থেকে ফিরে আসার পর ঠিক দু'মাস কেটে গেল। একদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই শুতে যাবে, হঠাৎ গেটের বাহিরে ক্রিং ক্রিং করে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল—'তার আছে বাবু'—

এত রাত্রে আবার কার টেলিগ্রাম এল ভেবে বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লাম। তাড়াতাড়ি খামখানা ছিঁড়ে ফেলে দেখি—

—'কাল আসাম মেলে পৌঁছাবো'—

—**শিলু**

আমার কাঁধের ওপরে ঝুঁকে সবাই টেলিগ্রামখানা দেখছিল। পড়া হতে না হতেই কে ছোঁ মেরে কেড়ে নিলে—তারপরেই বাড়ীময় সে কি হৈ-হৈ ব্যাপার। সারা রাত আহ্লাদে কেউ ঘুমোতেই পার্‌লে না, বাচ্ছা গুলোও সব উঠে পড়্‌ল।

পরদিন দুপুরে দল বেঁধে সবাই চল্‌লাম শিয়ালদহ ষ্টেশনে। দুটো বাজ্‌তে সতেরো মিনিটে দৈত্যের মত ফোঁসাতে ফোঁসাতে আসাম মেল ছুটে এসে থেমে গেল। গাড়ী থেকে মোটা-সোটা একটি ভদ্রলোক নামলেন, তার পেছনে হাফ্ প্যাণ্ট আর হাত-কাটা কামিজ পরে শিলু আর সবারই পেছনে দাঁত বের করে তাম্‌তিরাম।

হাস্‌তে হাস্‌তে আমাদের কাছে এগিয়ে এসে শিলু বল্‌লে, —"খালিদাদা, ইনিই অরিন্দম বাবু!"

শিলু বন্দী হল

কেমন করে কি হল সে গল্প শিলু আমাদের যেমন বলেছিল তোমাদের ঠিক তেম্‌নি বল্‌ব। আমার মুখে না শুনে শিলুর মুখে শুন্‌লেই তোমাদের বেশী ভালো লাগ্‌বে।

শিলু বল্‌লে—তোমাদের টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়ে চা খেতে গেলাম। মৌমাছি যখন মাটি ছাড়্‌ল তখন ঠিক সাড়ে ছ'টা। গৌহাটি এলাম দশটা বাজতে এগার মিনিটে। হিসেব করে দেখ্‌লাম তোমরা যখন মোটরে চড়ে ঘোরপাক্‌ খেতে খেতে উঠ্‌বে আমরা তখন শিলঙের বাড়ীতে চান করে ভাত খেয়ে রোদ পোহাব।

তাম্‌তিকে বল্‌লাম—শিলঙ্‌ ত এসেই গিয়েছি, এত তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে কি হবে, একটু ঘুরে যাই চল্‌—আর সেই হল বিপদ।

তোমাদের আগে চেরাপুঞ্জি দেখ্‌বো মতলব করে শিলঙে না থেমে সোজা চেরার দিকে উড়ে চল্‌লাম। রাস্তায় তোমাদের

কি দুর্দ্দশা হবে আমি আর তাম্‌তি তাই বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌লাম, কিন্তু একটু পরেই আমাদের যে কি হবে তা' ত' আর তখন জান্‌তাম না! বৃষ্টি দেখে যদি শিলঙে নেমে পড়্‌তাম তাহ'লে কোনই গোল হোত না, কিন্তু ভাব্‌লাম এ আর এমন কি জল—স্বচ্ছন্দে চেরা ঘুরে আসা যাবে। শিলং পিছনে ফেলে কয়েক মাইল যেতেই জলটা হঠাৎ খুব চেপে এল। অনেক নীচে পাইন গাছ গুলো এমন মাতামাতি কর্‌তে লাগ্‌ল যে ভাব্‌লাম না এলেই ছিল ভালো। কিন্তু তখনও জেদ ছাড়্‌তে পার্‌লাম না। সাম্‌নে আকাশ মেঘে-মেঘে একেবারে ঢেকে গেল, চারিপাশে কুয়াশায় কিছুই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, মৌমাছি ভয়ানক দুল্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু তবু আমরা ফির্‌লাম না।

তারপর হঠাৎ কি যে হয়ে গেল কে জানে। ঝড়ের ধাক্কা কিংবা যার জন্যেই হোক্ কম্পাসের কাঁটা গেল আট্‌কে। এতক্ষণ সাম্‌নে কিছু না দেখ্‌তে পেলেও কম্পাস্ দেখে ঠিক চালাচ্ছিলাম, কিন্তু এইবার সব গোলমাল হয়ে গেল। কোথায় উড়ে চলেছি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না, শুধু চেষ্টা দেখ্‌তে লাগ্‌লাম যদি মেঘ কি কুয়াশার মধ্যে একটুখানি ফাঁক পাওয়া যায়।

এম্‌নি করে প্রায় সওয়া ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর ভারী ভয়

হল। এতক্ষণ খুব কম হলেও দেড়শ মাইল ওড়া হয়েছে, কিন্তু কোন্‌দিকে যে যাচ্ছি তার কিছুই জানি না! চেরাপুঞ্জির রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি, শিলং কোন দিকে তার ঠিকানা নেই, কোনও পাহাড়ে যদি ধাক্কা লাগে তাহলেই শেষ।

ভাব্‌লাম হয়ত এবার মেঘটা একটু পরিষ্কার হবে। জলকে অত ভয় ছিল না, যত ভয় ছিল মেঘকে। কিন্তু পরিষ্কার ত' হ'লই না, আরও অন্ধকার ক'রে চেপে বৃষ্টি এল। আমি দেখ্‌লাম মহা বিপদ। আরও খানিকটা এম্‌নি ওড়ার পর বুঝ্‌তে পার্‌লাম যে শীগ্‌গির যদি একটা রাস্তা ঠিক্ কর্‌তে না পারি তাহলে আর কোনও আশা নাই। শিলং আসার জন্য যতটা তেল দরকার তার চেয়ে অনেকটা বেশীই সঙ্গে নিয়েছিলাম, কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে এম্‌নি উড়তে হবে তা' ত' আর জান্‌তাম না। একটু পরে তেল ফুরিয়ে যাবে আর তখন নাম্‌তে হবেই। পাহাড়ে পাহাড়ে কোথাও একটু ফাঁকা জায়গা নাই—মরণ নিশ্চিত।

ঠিক সাড়ে এগারটায় তেল ফুরিয়ে এল। প্রতি মুহূর্ত্তেই ভাব্‌ছি এইবার সব শেষ হয়ে যাবে, এমন সময় হঠাৎ বৃষ্টি থেমে গেল। মেঘ আর কুয়াশার মধ্যে একটা ফুটো দিয়ে দেখতে পেলাম খানিক দূরে একটা সমান মাঠ। সেই দিকেই মৌমাছির মুখ ফিরিয়ে দিলাম। কপালের জোর ছিল নিশ্চয় নইলে এমন অবস্থায় পড়লে গুঁড়ো হয়ে যাবারই কথা। কিন্তু আমরা ঘুরে-

ঘুরে যেই এসে সেই মাঠটাতে নামলাম, অম্নি তেল একেবারে ফুরিয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে আবার চারিধার মেঘে ঢেকে জল চেপে এল।

মাটিতে নেমে তবু একটু আশা হ'ল বৃষ্টি থামলে হয় ত বা পথ খুঁজে বার করতে পারব। বৃষ্টি কিন্তু থাম্ল না, সমানে চল্ল আড়াইটা পর্য্যন্ত। তোমরা ততক্ষণে বোধ হয় বাড়ী পোঁছে, আমাদের জন্যে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিয়েছ, না?

ক'লকাতা থেকে আসার সময় তাম্তি বুদ্ধি করে সঙ্গে এক বাক্স বিস্কুট আর ফ্লাস্কে চা এনেছিল, তাই খেয়ে দিনটা কেটে গেল। চারটের পর বৃষ্টি একেবারে বন্ধ হয়ে গেল, মেঘ কেটে রোদের মুখও দেখ্তে পেলাম। তাম্তিকে মৌমাছির পাহারায় রেখে আমি নেমে পড়লাম পথ খুঁজতে। রাত্রির আগেই, যেমন করে পারি একটা গ্রামে আশ্রয় নেব, আর পরদিনই হয়ত বাড়ী পোঁছে যাব, এই ছিল মনে। তখন কি আর জানি এত কাণ্ড হবে?

মৌমাছি নেমেছিল ঠিক মাঠের মাঝখানে। একটুখানি এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা রাস্তার চিহ্ন, মনে হল যেন পায়ে হাঁটা রাস্তা। এই পথে গেলেই কোনও গ্রামে পোঁছাব মনে করে খুব জোরে জোরে হাঁটতে লাগ্লাম। কিন্তু হেঁটে

চলেইছি, রাস্তার আর শেষ নাই। পাহাড়ের গা ঘেঁসে, ঝর্ণার পাশ দিয়ে রাস্তা চলেছে। কোথাও ঝর্ণার জলে রোদ প'ড়ে ঝিক্‌মিক্ কর্‌ছে, কোথাও বা গাছপালার ছায়ায় চারিধার একেবারে অন্ধকার। কোথাও বেশ শুক্‌নো খট্‌খটে, আর কোথাও বা শেওলায় এমন পিছল যে খুব সাবধানে হাঁটতে হয়। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর এসে পড়্‌লাম, কিন্তু তবু পথের শেষ নাই। ফিরে যাওয়াও তখন মুস্কিল। ফিরে যেতে যে সময় লাগ্‌বে হয়ত ততক্ষণ হাঁট্‌লে গ্রামে পৌঁছে যাব, এই মনে করে আবার চল্‌তে লাগ্‌লাম। পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। একটা পাহাড়ের আড়ালে যেতেই রাস্তাটা অন্ধকার হয়ে এল কিন্তু কোথাও মানুষের চিহ্নটুকুও দেখলাম না—এমন কি একটা গরু ছাগলও দেখলাম না কোথাও। এতক্ষণ মনে খুব আশা ছিল যে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে যখন মরি নি তখন আর কোনও ভয় নাই, কিন্তু এবার ভাব্‌তে লাগলাম যে, ধাক্কা খেয়ে ত মরিনি কিন্তু ফিরে যাব কেমন করে? মৌমাছি আর উড়বে না নিশ্চিত, এক ফোঁটা তেলও আছে কি না সন্দেহ। লোকজনহীন এই তেপান্তরের মাঠে ক'দিন আমাদের কাটবে?

হঠাৎ একটা পাহাড়ের কাছে এসে থেমে গেলাম। পায়ে হাঁটা রাস্তাটা এঁকে-বেঁকে ওপরে উঠে গিয়েছে; একেবারে চূড়োর কাছে একরাশ কুয়াশা জমা হয়ে আছে, তার ওপারে

কিছুই দেখা যায় না। পাহাড়ের ওপরে বোধ হয় লোকের বসতি, এই মনে করে ওপরে উঠতে লাগলাম, কিন্তু কি চড়াই রাস্তা!

হাঁপাতে হাঁপাতে উঠতে-উঠতে ভাবতে লাগলাম এত উঁচু পাহাড়ের ওপরে না জানি কোন্ দেশী গ্রামে গিয়ে হাজির হব। সেখানকার লোকগুলো যে কি ভাষায় কথা কইবে মনে মনে তাই নিয়ে তোলপাড় করতে লাগলাম। আমার বিদ্যেতে যদি না কুলোয় তাহলে কেমন করে ইসারায় কথাবার্ত্তা চল্‌বে, মনে মনে তাই কল্পনা করে নিজেই হাস্‌তে লাগলাম। ভাগ্যিস্ মানুষ জান্‌তে পারে না কার অদৃষ্টে কি আছে, নইলে তখন আমার মুখে হাসি আর ফুট্‌ত না।

পাহাড়ের ওপরে উঠে কোনও গ্রাম যে একটা পাওয়া যাবেই এ সম্বন্ধে তখন আর আমার একটুও সন্দেহ ছিল না। একটা সমস্যা তখন খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল—পেট্রোল পাওয়া যাবে কোথায়?

দু' চার দিন না হয় খাশিয়াদের গ্রামে অতিথি হ'য়ে থাকা যেতে পারে কিন্তু বাড়ী ফিরতে হবে ত! মৌমাছির ট্যাঙ্ক একেবারে খালি, শিলং কোন্ দিকে কতদূর তার ঠিকানা নাই। লোক পাঠিয়ে সেখান থেকে তেল আনিয়ে তারপর মৌমাছিকে ওড়ান—সে এক বিরাট ব্যাপার।

এমনি সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে উঠে চলেছি। পাহাড়ে ওঠা ত আর অভ্যাস ছিল না। তাই খানিক পরেই পা ধরে গেল। একটুখানি জিরিয়ে নিয়ে আবার যখন চল্‌তে আরম্ভ করেছি—মনে হল যেন পাহাড়ের চূড়োয় কুয়াশা আরও ঘন হয়ে জমেছে, আর খানিকটা যেন নীচে নেমে আস্‌ছে।

চল্‌তে চল্‌তে রাস্তা ক্রমশঃ সরু হয়ে এল। সূর্য্য তখনও একেবারে ডুবে যায় নি, পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল; গাছের মাথাগুলো ঝিক্‌মিক্ করছিল তখনও। হঠাৎ এক জায়গায় এসে রাস্তা শেষ হয়ে গেল; ঠিক সাম্‌নেই খাড়া একটা প্রকাণ্ড পাহাড় পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে। ওপারে যাবার যে কোনও রাস্তা আছে মনে হয় না দেখে।

এ আবার কি হল ভেবে ভারী অবাক্ হয়ে গেলাম। এতখানি রাস্তা হেঁটে এলাম তবে কি করতে? সাম্‌নে যাবার পথ যে আর নাই সে ত স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে—আবার কি ফিরতে হবে তাহ'লে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছি—হঠাৎ দেখি দূর থেকে একটা কুয়াশার রাশি গড়িয়ে গড়িয়ে তীর বেগে নীচে নেমে আসছে। দেখতে দেখতে প্রায় আমার কাছে এসে পড়্‌ল; বিষম ভয় পেয়ে ছুটে পালাতে গেলাম কিন্তু পালান আর হল না। চারিধার থেকে কুয়াশার রাশি একেবারে ঘিরে ফেল্‌লে আমাকে। গাছপালায় জায়গাটা অন্ধকার হয়েই ছিল,

ভালো করে কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না। কাণের কাছে হঠাৎ একটা শব্দ হল 'বুঁ' আর অমনি মনে হল কে যেন হাত ধরে হ্যাঁচ্‌কা টান দিলে। সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য ডুবে চারিধার একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল।

পিটৌকিটি

অন্ধকারের মধ্যেই কারা আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চল্‌ল। চারিধারে কিছুই দেখা যায় না, কাদের হাতে পড়েছি, তারা যে কি রকম কিছুই আন্দাজ করতে পারলাম না। আর অবাক্ কাণ্ড, আমার আগে পেছনে চারিধারে যদিও তারা ঘিরে চল্‌ল নিজেদের মধ্যে একটুও কথাবার্ত্তা কইল না।

খানিক দূর এসে সবাই থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। খুব ভারী জিনিষ টেনে সরালে যেমন একটা বিশ্রী শব্দ হয় তেমনি একটা শব্দ কাণে এল, আর একটু পরেই দেখতে পেলাম খানিক দূরে মশাল নিয়ে কতকগুলো লোক আসছে।

মশালের আলোতে দেখলাম লোকগুলো মোটেই কদাকার কিংবা কুৎসিত নয়। খাসা হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, কতকগুলো ত' রীতিমত পালোয়ান বললেই চলে। গায়ের রং ঠিক তামাটে নয়, একটু হল্‌দের ভাব আছে। মুখগুলো চ্যাপ্টা, দাড়ী বা গোঁফের চিহ্নমাত্র নাই। মাথায় ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া চুল।

কিন্তু পিছন ফিরে চমকে উঠলাম। আমাকে যারা বন্দী করে নিয়ে এল, মুখ, চোখ, মাথা কিছুই নাই তাদের—হাত, পাও নাই বুঝি! প্রকাণ্ড একটা ভারী পাথর ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে একটা সুরঙ্গের মুখ সবাই মিলে বন্ধ কর্‌ছে—আমি ভয়ে শিউরে উঠ্‌লাম।

একটু পরেই কিন্তু আমার ভয়-ভাবনা ঘুচে গেল। আমার চোখের সামনেই মশালধারী লোকগুলো সেই ভূতুড়ে লোক-গুলোর গা থেকে এক একটা সাদা পোষাক খুলে ফেল্‌লে। দেখলাম বোরখার মতন একটা পোষাকে আপাদমস্তক ঢাকা ছিল বলেই তাদের দেখে ভয় পেয়েছিলাম আর এইবার বুঝ্‌লাম যে পাহাড়ের চূড়োয় কুয়াশা বলে যাকে মনে করেছিলাম সে সত্যি কুয়াশা নয়, এরাই ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল। পোষাক ছেড়ে এরাও মশালধারীদের সঙ্গে বেমালুম্ ভীড়ে গেল, একে-বারে সবাই জাত ভাই। এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার উপরে কোনও অত্যাচার এরা করে নি তাই একটু সাহস পেয়ে বললাম—'ছেড়ে দাও আমায়। কে তোমরা?' আরও কি বল্‌তে যাচ্ছিলাম হয়ত, কিন্তু অসভ্যগুলো হঠাৎ লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে নাচ্‌তে আরম্ভ করে দিলে। লাফিয়ে, নেচে, গড়াগড়ি দিয়ে তারা এমন কাণ্ড আরম্ভ করে দিলে যে আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। বুঝতেই পারলাম না যে এমন খুসীর কথাটা কি।

অসভ্যগুলো চীৎকার করে নাচতে আরম্ভ করে দিল

থেকে থেকে খালি একটা কথা সবাই মিলে বল্‌তে লাগ্‌ল—'নুয়াগা, নুয়াগা'।

হঠাৎ দু' একজন চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—'পানিতো, পানিতো', আর অমনি সব গোল্‌মাল এক নিমেষে থেমে গেল। দেখ্‌লাম দূরে আরও কতকগুলো লোক বর্শা হাতে মশাল নিয়ে মাঝখানে কা'কে ঘিরে আস্‌ছে।

একটু পরেই যিনি এসে সামনে দাঁড়ালেন দেখেই বুঝ্‌লাম এদের রাজা কিংবা সেনাপতি হবেন। মাথায় এদের চেয়ে একটু বড়, বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা। অন্য লোকগুলো পরে আছে গাছের বাকল আর এঁর পরণে চিতে বাঘের চাম্‌ড়া—গা অবশ্য আর সবারই মত খালি। কোমরে প্রকাণ্ড একটা ছুরি, আর সবার চেয়ে অদ্ভুত গলায় এক ছড়া মালা—ফুলের কিংবা নুড়ির নয়, ডিমের মত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রায় কুড়ি পঁচিশটা চুণির।

এই লোকটাকে মাঝখানে রেখে বাকী সকলে চারিধারে গোল হয়ে দাঁড়াল। তারপর কি যে কথাবার্ত্তা হতে লাগল তার এক বর্ণও বুঝলাম না। শেষে দেখে মনে হল সেনাপতি খুসী হয়েছেন। দলবলকে কি একটা আদেশ দিয়ে তিনি চল্‌লেন; সঙ্গের লোকগুলো আমাকে ইসারা করলে পিছনে যেতে। তা ছাড়া তখন আর উপায়ই বা কি? আমি এদের সঙ্গে চল্‌লাম।

প্রায় কুড়ি মিনিট পরে এসে উপস্থিত হলাম একটা গুহার মুখে। কতকগুলো লোক মশাল হাতে আমার সঙ্গে গুহায় ঢুকে ইসারায় বুঝিয়ে বল্‌লে সেইখানেই বিশ্রাম করতে হবে। এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে তখন আর ভাববার ক্ষমতা ছিল না; মাটির ওপরেই গড়িয়ে পড়্‌লাম। রক্ষীদল আমাকে ছেড়ে গুহার মুখে মশাল হাতে পায়চারী কর্‌তে লাগ্‌ল।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি। খুব ভোরে ঘুম ভাঙল। রক্ষীগুলো নিবানো মশাল হাতে তখনও গুহার মুখে পায়চারী কর্‌ছে। আমাকে উঠ্‌তে দেখে তারা কাছে এল, তারপর ইসারা করে ডাকল সঙ্গে যেতে। খিদেয় তখন পেট চোঁ-চোঁ—যা থাকে কপালে মনে করে উঠে দাঁড়ালাম।

রাত্রে অন্ধকারে কিছু লক্ষ্য করিনি, এখন দিনের আলোতে চারিধার দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। যে গুহায় রাত কাটিয়েছিলাম তার পাশ দিয়েই সরু একটা রাস্তা নীচে নেমে গিয়েছে, একধারে পাহাড়ের গা আর একধারে অতল খাদ। আমার আগে পিছনে লোকগুলো বেপরোয়া ভাবে চল্‌তে লাগ্‌ল—এ যেন পিচ্‌ ঢালা বড় রাস্তা, কিন্তু আমি পাহাড়ের গা ঘেঁসে ভয়ে ভয়ে চললাম অতি সাবধানে। হঠাৎ একটা মোড় ঘুরে দেখি দূরে অনেক নীচে ধোঁয়াটে কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে চারিধারে খাড়া পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, আর মাঝখানে সরু একটা নদী

চলেছে সাপের মতন এঁকে বেঁকে। তারই একধার ঘেঁসে কতকগুলো ঘরবাড়ী।

নামতে নামতে গ্রামখানা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। প্রথমে দূরের পাহাড়গুলো, তারপর গাছপালা, তারপর প্রত্যেকটা বাড়ী, সব স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলাম। কিন্তু রাস্তা বুঝি আর শেষ হয় না, চলেছি ত চলেইছি!

হঠাৎ রক্ষীগুলো দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। কয়েক পা দূরে একটা ঝোলা পুল দেখিয়ে ইসারায় বল্‌লে পার হতে হবে ওটা। কাছে গিয়ে দেখি লতা পাকিয়ে পাকিয়ে দড়ির মতন করে এপার থেকে ওপারে একটা পুল বাঁধা—সেই পুল পার হয়ে যেতে হবে।

সাম্‌নের লোকগুলো অবলীলায় ওপারে চলে গেল, কিন্তু আমার প্রাণ কেঁপে উঠল ভয়ে। নীচে চেয়ে দেখ্‌লাম অতল খাদ, একটু পা হড়্‌কালে আর দেখ্‌তে হবে না—এই পুল পেরোব কেমন করে? রক্ষীগুলো আমাকে দাঁড়াতে দেখে কি বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌ল। যারা আগে গিয়েছিল তারা ওপার থেকে কি একটা বল্‌তেই, এপারের একটা মস্ত জোয়ান হঠাৎ আমাকে কোলে তুলে নিলে। আমি কিছু বল্‌বার আগেই ছোট্ট খোকার মতন আমাকে কাঁধে ফেলে তর্‌তর্ করে পুল বেয়ে নিমেষে ওপারে গিয়ে নামিয়ে দিলে।

গ্রামে যেতেই যে যেখানে ছিল এসে ঘিরে ধরল। মেয়ে আর পুরুষগুলোর পরণে চামড়া কিংবা গাছের ছাল, ছোট ছেলের পাল একেবারে দিগম্বর। কিন্তু কদাকার কিংবা কুৎসিত কাউকে দেখলাম না, সবাই বেশ হৃষ্টপুষ্ট।

খিদেয় তখন প্রাণ যায়। মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে পেটে হাত বুলিয়ে রক্ষীদের বোঝালাম যে খাবার দাও বাপু, নইলে আর চলে না। সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের মধ্যে একটা সোর-গোল পড়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা রক্ষী নিয়ে এল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দু টুকরো তরমুজ আর ডজন খানেক পোড়া ভুট্টা। যতক্ষণ খাচ্ছিলাম সবাই ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাক্‌ল। জলযোগ সারা হলে আবার রক্ষীদের সঙ্গে চল্‌লাম, আর আমাদের পিছনে সবাই চেঁচাতে চেঁচাতে আস্‌তে লাগ্‌ল।

দুপাশে ছোট্ট ছোট্ট মাটির বাড়ী, অদ্ভুত দেখ্‌তে। একেবারে গোল, চারিধারে ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটা ফুটো, বোধ হয় জানালা হবে। একটা বড় বাড়ীর সামনে এসে রক্ষীগুলো দাঁড়িয়ে পড়ল। এ বাড়ীটা কিন্তু গোল নয়, চৌকা ধরণের। দুয়োর জানালা অবশ্য কাঠের নয়, লম্বা লম্বা কঞ্চি আড়াআড়ি করে বেঁধে ঝাঁপের মতন একটা ব্যাপার।

বাড়ীটার সাম্‌নে আরও কতকগুলো রক্ষী দাঁড়িয়েছিল।

এবার তারা এগিয়ে এসে আমাকে ঘিরে ফেল্‌লে। যারা আমাকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল তাদের বোধ হয় বাড়ীর মধ্যে যাবার অনুমতি ছিল না, কারণ নতুন রক্ষীগুলো এবার আমাকে নিয়ে চল্‌ল।

বাড়ীর ভিতরটা যতখানি অন্ধকার হবে ভেবেছিলাম তা' নয়। চারিপাশে ছোট ছোট জানালা দিয়ে আলো আর বাতাস দুইই আস্‌ছিল। অনেকগুলো ছোট ছোট কুঠরী পার হয়ে আমরা মস্ত একটা ঘরে এসে হাজির হলাম। চারিধারে কতক-গুলো খুব জোয়ান জোয়ান লোক বর্শা হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, আর ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা পাথরের সিংহাসনে থুড়্থুড়ে এক বুড়ো বসে।

আমাকে ঠিক বুড়োর সামনে দাঁড় করিয়ে রক্ষীরা সরে গেল। বুড়ো রাজা কুৎকুতে দুই চোখে দেখ্‌তে লাগ্‌ল আমাকে। এতক্ষণ আমার একটুও ভয় হয় নি। ধরা পড়ার পর থেকে যে লোকগুলোকে দেখেছি, তারা শত্রু হলেও দেখতে হিংস্র ছিল না। কিন্তু এই বুড়োকে দেখে প্রাণ যেন শিউরে উঠল। বয়সে কুঁজো হয়ে পড়েছে, গায়ের চামড়া লোল, কিন্তু চোখ দুটো কি উজ্জ্বল! লোকে বলে সাপের চোখে চোখ পড়লে দৃষ্টি ফেরান যায় না; বুড়োর চোখ দুটোও তেমনি—চোখের দিকে তাকালেই প্রাণ আঁৎকে ওঠে।

অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টে আমাকে দেখে রাজা আদেশের স্বরে বল্‌লেন, "পিটোকিটি—পিটোকিটি সুমামা।" রাজার স্বরে চম্‌কে উঠ্‌লাম; দাঁড়কাকের ভাঙ্গা গলার ডাকও এর চেয়ে ভালো।

রাজার আদেশে দু'জন রক্ষী ছুটে গেল। মিনিট কয়েক পরেই তারা ফিরে এল, তাদের পেছনে গুরুগম্ভীর চালে হেল্‌তে দুল্‌তে এলেন সেনাপতি মশাই, ধরা পড়ার একটু পরেই যাঁর প্রথম দেখা পেয়েছিলাম। একটা কথা বুঝলাম, ইনি যে-ই হন, নাম এঁর পিটোকিটি আর সুমামা মানে বোধ হয় ডাকো কিংবা আনো।

অদ্ভুত ভাষায় পিটোকিটির সঙ্গে রাজার কথাবার্ত্তা আরম্ভ হ'ল। বুড়ো রাজা ক্রমে গরম হয়ে উঠ্‌তে লাগলেন—দেখলাম কি নিয়ে তাঁর পিটোকিটির সঙ্গে মনান্তর আরম্ভ হয়েছে। ধীর ভাবে পিটোকিটি রাজার কথার উত্তর দিতে লাগল; রাজা যত হাত পা ছুঁড়ে মুখ বিকৃত করে চীৎকার করেন, পিটোকিটি ততই শান্ত স্বরে তাঁর যুক্তি খণ্ডন করে। কোন্ ভাষা আর কি তার বিষয় কিছুই বুঝলাম না; মাঝে মাঝে শুধু আমার দিকে হাত নেড়ে পিটোকিটি বল্‌তে লাগ্‌ল, "মোম্মা, মুবুঁবুঁনাসি" আর রাগে মুখ কালো করে গলাভাঙ্গা দাঁড়কাকের মতন রাজা চেঁচাতে লাগল—"আঁসোঁমাসিনা সেনা আঁসোঁমাসিনা"। কে যে শত্রু,

আর কে মিত্র কিছুই বোঝবার যো নাই, তবু মন যেন বল্‌তে লাগল পিটোকিটি আমাকে বাঁচাতে চায়, আর বুড়ো রাজা চায় খেয়ে ফেল্‌তে।

হট্টগোল ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ল। রাজা কিছুতে বোঝে না, পিটোকিটিও ছাড়বার পাত্র নয়। কতক্ষণ যে এ ভাবে চল্‌ত আর ফলাফল কি হত জানি না, কিন্তু হঠাৎ সোরগোল তুলে কতকগুলো রক্ষী ছুটে এল। পিটোকিটি আর রাজার তর্ক নিমেষে থেমে গেল, সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল কি ব্যাপার দেখতে।

পনের কুড়িজন লোক বর্শা হাতে কাকে ধরে নিয়ে আসছে; রাজার সাম্‌নে এসে তারা সরে দাঁড়াল। এক পা এগিয়ে গিয়ে সাম্‌নের দিকে একটুখানি ঝুঁকে দেখি মাঝখানে তাম্‌তিরাম দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছে।

[illegible]

[illegible] অতর্কিত আবির্ভাবে সেদিনকার মতন সভা ভঙ্গ হল। পিটোকিটির সঙ্গে আমি আর তাম্‌তি রাজার বাড়ী ছেড়ে বার হয়ে এলাম। গ্রামের সবগুলো বাড়ী ছাড়িয়ে এসে নদীর ধারে একটা বাড়ীতে পিটোকিটি নিয়ে গেল আমাদের। মাত্র দুটো কুঠরী; সামনের ঘরখানাতে রক্ষীদের বস্‌তে বলে আমাদের নিয়ে অন্য ঘরখানাতে এল। একপাশে একরাশ শুকনো গাছের ছাল আর চামড়া স্তূপাকারে পড়ে, সেই দিকে আঙুল বাড়িয়ে পিটোকিটি বস্‌তে বল্‌লে।

বিছানা পেয়ে আমি গা এলিয়ে দিলাম। হাসছ তোমরা, কিন্তু সে সময়ে ঐ বিছানা পেয়ে যে কি আরাম মনে হচ্ছিল আমিই জানি। হাত পা ছড়িয়ে বল্‌লাম, "তুই কেমন করে এলি তাম্‌তি?"

তাম্‌তি দু'পাটি দাঁত বের করে হেসে উঠ্‌ল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তার কাহিনী শেষ হয়ে গেল। সারারাত

'মৌমাছি' পাহারা দিয়ে ভোর বেলাও আমি ফির্লাম না দেখে আমার খোঁজে তাম্তি রওনা হয়েছিল। তারপর ঠিক আমি যেমন করে বন্দী হয়েছিলাম সে-ও তেমনি করে ধরা পড়ে' সোজা একেবারে হাজির হল রাজার সভায়।

পিটোকিটির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে গলা একটুখানি নামিয়ে তাম্তি বল্লে, "আপনি এসেছিলেন খালি হাতে, আমি কিন্তু তৈরী হয়ে এসেছি। আপনার কার্টিজ্ বেল্ট্টা আর পিস্তল দুটো মৌমাছির মধ্যেই ফেলে এসেছিলেন, আমার কোটের তলে কোমরে বেঁধে এনেছি।"

তাম্তির বুদ্ধি দেখে খুসী হলাম ; বললাম, "বাহাদুর তুমি।"

পিটোকিটি এতক্ষণ একেবারে নিশ্চল হয়ে বসে আমাদের কথাবার্ত্তা শুন্ছিল। এইবার উঠে এসে আমার গায়ে হাত দিয়ে বল্লে—'বা ডিংবা।' আমি বোকার মত ফ্যাল্ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকলাম। তাম্তি কি বল্তে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই পিটোকিটি নিজের বুকে হাত দিয়ে বলে উঠ্ল— 'পিটোকিটি।'

এইবার বুঝ্তে পারলাম ; আমিও নিজের বুকে হাত দিয়ে খুব গম্ভীর ভাবে বললাম—'শিলু্।' আমার গম্ভীর ভাব দেখে তাম্তি হেসে উঠ্ল, কিন্তু সে দিকে গ্রাহ্য না করে পিটোকিটি বার বার নিজের বুকে আর আমার বুকে হাত দিয়ে বল্তে

লাগ্‌ল পিটোকিটি, শিলু। তাম্‌তি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে নিজের বুকে দুটো হাত জড়ো করে বলে উঠ্‌ল—'হ্যাঁ আর এই তাম্‌তি।' তার দিকে একটুখানি অবাক্ হয়ে তাকিয়ে পিটোকিটি আবার জোরে জোরে চেঁচাতে লাগল, 'পিটোকিটি শিলু তাম্‌তি।' দেখে মনে হল যেন আহ্লাদে আটখানা।

এমনি করে আলাপ আরম্ভ হল। কয়েকদিনেই বেশ ভাব হয়ে গেল পিটোকিটির সঙ্গে। ও চাইত প্রাণপণে নিজেকে বোঝাতে, আমরাও কসুর কর্‌তাম না। শেষে হতাশ হয়ে বেচারা মাথা নাড়ত আর আমরা উঠতাম হেসে। রক্ষীগুলোও কোনও রকম উৎপাত করত না, সময়ে সময়ে চারিধারে হাঁ করে ঘিরে বসে আমাদের কথা শুন্‌ত।

দিন কাটতে লাগল মন্দ না। নদীতে চান কর্‌তে যেতাম; পিটোকিটির লোকেরা খাবার দিয়ে যেত, দু'তিন রকমের তরকারী, কোনও-টা কাঁচা কোনও-টা সেদ্ধ, কিসের একটা অদ্ভুত রুটি আর পেট ভরে ফল। বেশীর ভাগ খাবারই চিনি না—শাঁক-আলুর মতন কি একটা; তরমুজ, ভুট্টা, কাজু বাদাম, এই ক'টা বুঝ্‌তে পার্‌তাম। রাত্রে দুয়োরের গোড়ায় মশাল জ্বেলে বসে রক্ষীরা জটলা কর্‌ত—আমরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতাম।

এমনি করেই প্রায় দু'মাস কেটে গেল। পিটোকিটিদের

ভাষা একেবারে সড়গড় না হয়ে গেলেও আমি আর তাম্‌তি বেশ কথাবার্ত্তা বল্‌তে শিখে গেলাম। দিনরাত ভাব্‌তে লাগ্‌লাম কি করে পালান যায় কিন্তু উপায় দেখ্‌লাম না কিছু।

পিটোকিটির কাছে শুনলাম ওদের দেশের নাম 'নু' অর্থাৎ বাড়ী, আর নিজেদের ওরা বলে 'নুচিকানু' অর্থাৎ বাড়ীর মালিক। বুড়ো নুচিকানুরা বলে যে 'নু' ছাড়া পাহাড় গুলোর ওপারে আর কোনও দেশ নাই, থাকতেই পারে না। ওধারে শুধু 'সেনা'রা অর্থাৎ শয়তানরা থাকে।

অনেকদিন আগে আমাদেরই মতন আর একটা জীব না কি কোথা থেকে এদের দেশে এসেছিল। বুড়ো রাজা তখুনি হুকুম দিলেন তাকে 'ফম'বোম্‌বোম্ কর্‌তে, কারণ সবাই বলতে লাগল যে 'সেনা' না হলে পাহাড়ের ওপারে সে থাকবে কেন? আগে বুড়ো রাজার অখণ্ড প্রতাপ ছিল। তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করবার কল্পনা করতেও কারও সাহস হত না, কিন্তু ইদানীং তাঁর অত্যাচারে অনেকেই বড় বিরক্ত হয়ে উঠেছে, আর সেই জীবটাকে ফম্‌বোম্‌বোম্ করার পর থেকে কয়েকজন তরুণ নুচিকানুর মনে কেমন একটা সন্দেহ জেগেছে।

মাঝে মাঝে যখন বিষম কোনও অপরাধে নুচিকানুদের মধ্যে কাউকে ফম্‌বোম্‌বোম্ করা হয়, তখন সে যেমন চীৎকার

—পৃঃ

করে আর পালাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌তে থাকে, তেম্‌নি সেই জীবটাও এমন চীৎকার কর্‌ছিল যে কাণে তালা ধরে যায়। আর পালাতে সে মোটেই পারে নি। ফম্‌বোম্‌বোম্‌ শেষ-কালে ঠিক টেনে নিলে তাকে—অথচ বুড়ো রাজা আর তার বুড়ো বুড়ো মন্ত্রীরা বল্‌ত যে, সেনাদের ধর্‌তেই পারা যায় না, ধর্‌তে গেলেই তারা পাখী হয়ে উড়ে যায়।

সেই থেকে পিটোকিটি আর কয়েকজন সুচিকানুর মনে সন্দেহ জন্মেছে যে, হয়ত' পাহাড়ের ওপারে আরও অনেক 'নু' আছে, সেখানে তাদেরই মতন আরও নুবুঁবুঁনাসি অর্থাৎ মানুষ থাকে। যে এসেছিল সে সেনা নয়, একজন মানুষ। আমাদের ভাগ্যেও প্রথম দিনই ফম্‌বোম্‌বোম্‌ লাভ হয়ে যেত কিন্তু পিটোকিটি রাজার সঙ্গে খুব বচসা করে বলেছিল, "মোম্মা, নুবুঁবুঁনাসি, না, না ও মানুষ।" তরুণ সুচিকানুরা অনেকেই পিটোকিটির দলে, তাই বুড়ো রাজা জোর করে কিছু করতে ভয় পাচ্ছেন, নইলে তিনি আর তাঁর মন্ত্রীরা আমাদের ফম্‌বোম্‌বোম্‌ কর্‌তে পার্‌লে আর কিছু চান না।

সমস্ত শুনে আমার দিকে তাকিয়ে তাম্‌তি বল্‌লে, "সুসংবাদ বটে!"

হুকসি ভোঁসা

একদিন বিকেলের দিকে চামড়ার বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছি আর তাম্‌তি মনের আনন্দে নাক ডাকাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ বাহিরে ভয়ানক হট্টগোল শুন্‌তে পেলাম। ঘুম ভেঙে উঠে বসে লাল চোখ দুটো রগড়াতে রগড়াতে মুখখানা বেজার করে তাম্‌তি বল্‌লে—কি আপদ, এরা কি একটু ঘুমোতেও দেবে না—নাকি ?

আমি বললাম—ঘুমোস্‌ পরে, চল্‌ আগে দেখে আসি কি ব্যাপার।

কিন্তু আমাদের আর দেখতে যেতে হল না। কোলাহল করতে করতে এক দল নুচিকানু আমাদের দিকেই আস্‌তে লাগল। মাঝখানে একটা মেয়ে নুচিকানু হাউ হাউ করে কাঁদছে আর তাকে ঘিরে ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ, এক পাল বিষম চেঁচাতে চেঁচাতে এগিয়ে আসছে।

পিটোকিটি ছিল সেই দলে। এগিয়ে গিয়ে জিগেস্‌ কর্‌লাম

—"কি ব্যাপার পিটোকিটি? সবাই মিলে এমন কান্নাকাটি লাগিয়ে দিয়েছে কেন?"

মেয়েটার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এসে পিটোকিটি বল্‌লে—"ভারী বিপদ হয়েছে শিলু্। এর ছোট্ট মেয়েটা বাইরে খেলা করছিল, হঠাৎ কোথা থেকে একটা 'হুঁক্‌সি ভোঁসা' এসে তাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে—কিছুতেই আর ধরা দিচ্ছে না।"

হুঁক্‌সি ভোঁসা? আমি চমকে উঠলাম। তাম্‌তি জিগেস্ করলে—"সে আবার কি শিলুদা?"

বললাম—"তা' ত জানি না তাম্‌তি কিন্তু ব্যাপারটা যে গুরুতর তা' বুঝতেই পারা যাচ্ছে।"

আমাদের বিমূঢ় ভাব দেখে পিটোকিটি অবাক হয়ে বললে—"আচ্ছা মুস্কিল ত? হুঁক্‌সি ভোঁসা কি জানো না? হুঁক্‌সি ভোঁসা, সে-ই যে হুঁক্‌সি ভোঁসা!"

হাসি এল; বললাম—"তা-ত বুঝলাম যে হুঁক্‌সি ভোঁসা হল সে-ই হুঁক্‌সি ভোঁসা, কিন্তু জীবটা কি করে বলতে পার?"

চল্‌তে চল্‌তে পিটোকিটি বল্‌তে লাগল—"কি বিপদ, তোমরা হুঁক্‌সি ভোঁসা জানো না শিলু্? আচ্ছা বোকা ত! হুঁক্‌সি ভোঁসা আবার কি করবে? সবাই যা করে সে-ও তেমনি করে।"

তর্‌তর্‌ করে পুল বেয়ে ওপারে গিয়ে নামিয়ে দিল

—পৃঃ ২৫

তাম্‌তি হেসে উঠল—"ঠিক বলেছ পিটোকিটি; শিলুদা যে হুঁক্‌সি ভোঁসাকে চেনে না এ অত্যন্ত অন্যায়।"

আমি একটু বেয়াকুব হয়ে গেলাম; বললাম—"বুঝতে পারলাম না পিটোকিটি।"

চল্‌তে চল্‌তে হাত-পা নেড়ে পিটোকিটি আমাদের বোঝাতে লাগল—"হুঁক্‌সি ভোঁসা জানো না, আশ্চর্য্য ত? তোমাদের দেশে নাই? দাঁড়াও, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

বাধা দিয়ে তাম্‌তি বললে—"থাক, তোমাকে আর বুঝিয়ে দিতে হবে না। আমি যা জিগেস্ করি, বল দেখি। হুঁক্‌সি ভোঁসাটা দেখতে কেমন?"

একটু চটে উঠে পিটোকিটি বললে—"কেমন আবার? আমাদেরই মতন।"

আমি বললাম—"সে কি? মানুষ না কি?"

—"না, না, নুবুঁবুঁনাসি হবে কেন?"

তাম্‌তি জিগেস্ কর্‌লে—"হুঁক্‌সি ভোঁসার হাত ক'টা?"

—চারটে।"

আমি ত অবাক্! চম্‌কে উঠে তামতি বললে—"আর পা?"

—"চারটে!"

দু'জনেই আমরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম—সে কি! চার হাত, চার পা এমন কি জন্তু হ'তে পারে? দু' সেকেণ্ড ভেবে

তাম্‌তি বল্‌লে—"মাকড়সা নয় ত ?" আমি হেসে ফেল্‌লাম—বল্‌লাম—"গাঁজা টেনেছিস না কি ?"

পিটোকিটি বোঝাতে লাগল—"আর, হুঁক্‌সি ভোঁসার দাঁত আছে—"

ফট্ করে তাম্‌তি জবাব দিলে—"সে ত তোমারও আছে।"

পিটোকিটি ভয়ানক চটে উঠল। ভেংচি কেটে বল্‌লে—"তোমারও আছে! আমি কি হুঁক্‌সি ভোঁসা ?"

বুঝলাম পিটোকিটিকে কোনও কথা জিগেস্ করাই নিস্ফল। তাম্‌তিকে বললাম—"থাক্, থাক্ হয়েছে, চল্ তাড়াতাড়ি।"

একটু নরম হয়ে পিটোকিটি বললে—"হ্যাঁ, তাই চল। এতক্ষণ মেয়েটাকে নিয়ে কি কর্‌ছে কে জানে। গাছ থেকে ফেলে না দেয় আবার—"

আমি বললাম—"সে কি ? হুঁক্‌সি ভোঁসা গাছে থাকে নাকি ?"

—"থাকেই ত'। আমাকে আর কথা কইতে দিলে কই ? ঐ তাম্‌তিই যত গণ্ডগোল করলে।"

তাম্‌তি উত্তর দিলে না। মুখ ফিরিয়ে মুচকি হেসে উঠল—"ঠিক্ ঠিক্।"

গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে একেবারে শেষ বাড়ীটার কাছে এসে দেখি বহু লোক জমে গিয়েছে। কাছেই কতকগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ; তারই তলে লোকে লোকারণ্য। সবারই হাতে হাতিয়ার, হৈ হৈ ব্যাপার।

পিটোকিটি বললে—"মেয়েটাকে নিয়ে হুঁক্সি ভোঁসা ঐ গাছে উঠে পালিয়েছে, কিছুতেই নেমে আসছে না।"

আমি আর তাম্তি অতি সন্তর্পণে গাছের নীচে এসে দাঁড়ালাম। চারিধারে বর্শা হাতে মুচিকানুরা আস্ফালন করতে লাগল। অতি ভয়ে ভয়েই চোখ তুলে ওপর দিকে চাইলাম, না জানি গাছের ওপরে সাপ কি বাঘ কি দেখবো। কিন্তু মাথা তুলেই তাম্তি এমন বিকট অট্টহাস্য করে উঠল যে সমস্ত লোক একেবারে 'থ'! মাটি থেকে প্রায় ত্রিশ বত্রিশ হাত উঁচুতে দুটো মোটা ডালের মাঝখানে ছোট্ট একটা মেয়েকে বুকে নিয়ে দিব্যি আরামে বসে একটা প্রকাণ্ড বাঁদর আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

তাম্তির হাসিতে মহা বিরক্ত হয়ে পিটোকিটি বললে—"সব সময় হাসি ভাল লাগে না, তাম্তি; এমন বিপদেও হাসি আসে তোমার?" সঙ্গে সঙ্গে গাছের ওপর থেকে বাঁদরটা খ্যাক্ খ্যাক্ করে যেন সায় দিয়ে উঠল।

পিটোকিটি বলতে লাগল—"হুঁক্সি ভোঁসা প্রথমে খুব

নীচুতেই বসেছিল শিলু। আমরা তাড়া করতেই ওপরে উঠে পালিয়ে যাচ্ছে, কিছুতেই নামছে না আর। গাছে উঠতেও ভয় করছে, মেয়েটাকে যদি রাগ করে কাম্ড়ে দেয় কি মেরে ফেলে—”

আমি বললাম—“আগে এক কাজ কর পিটোকিটি। সবাইকে বল হট্টগোল একেবারে বন্ধ করতে। তোমরা যত হৈ হৈ করবে, হুঁকৃসি ভোঁসা ততই ওপরে পালিয়ে যাবে, কিছুতেই ধর্তে পারবে না।”

পিটোকিটির হুকুমে সবাই চুপ করে গেল। তখনও হাসি চাপবার চেষ্টায় তাম্তি ফুলে ফুলে উঠছে! আমি বললাম—“হাসবার অনেক সময় আছে তাম্তি, এখন কি করা যায় তাই বল্।”

তাম্তির দিকে ভ্রূকুটি করে পিটোকিটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাক্ল। আমি যে তাম্তির পরামর্শ চাইছি এটাও পিটোকিটির অসহ্য।

বহু কষ্টে হাসি চেপে তাম্তি বললে—“বাপ্রে বাপ্! আর একটু হলে হাসতে হাসতে দম ফেটে মরে যেতাম। পিটোকিটিকে বলুন চিন্তার কোনও কারণ নাই, মেয়েটাকে আমি এখুনি নামিয়ে আনছি।”

পিটোকিটিকে ডেকে বললাম—“শুন্ছ পিটোকিটি? তাম্তি বলছে চিন্তার কোনও কারণ নাই।”

কথাটা বোধ হয় পিটোকিটির বিশ্বাস হল না; চুপ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাক্‌ল।

তাম্‌তি বললে—"কিছু খাবার আনিয়ে দাও পিটোকিটি, খুব ভালো ভালো খাবার—

গম্ভীরস্বরে পিটোকিটি জবাব দিলে—"তোমাকে খাওয়াতে এখানে ডেকে আনি নি।"

তাম্‌তি হেসে উঠ্‌ল—"কি বিপদ! আমি খাবো কেন? তোমার হুঁক্‌সি ভোঁসার জন্যে খাবার চাইছি। খাবার দেখিয়ে গাছ থেকে ওকে নামিয়ে আনতে হবে।"

এতক্ষণে পিটোকিটি খুসী হল। ভাব দেখে মনে হল তাম্‌তির মতলবটা ভারী পছন্দ হয়েছে।

নুচিকানুরা ছুটে গিয়ে খাবার নিয়ে এল; শাঁক আলু, বাদাম, ভুট্টা, আরও কি-কি কে জানে। সবাইকে সরিয়ে দিয়ে গাছের তলায় মাটিতে খাবার ছড়িয়ে অনেকক্ষণ সাধ্যসাধনা করা হল, কিন্তু হুঁক্‌সি ভোঁসা কিছুতেই নাম্‌ল না।

অনেকক্ষণ পরে তাম্‌তি বললে—"এ বুদ্ধি খাট্‌ল না শিলুদা, অন্য মতলব করতে হচ্ছে।"

বিমর্ষ মুখে পিটোকিটি জিগেস্ করলে—"কি হবে তাম্‌তি? মেয়েটাকে জ্যান্ত পাওয়া যাবে ত?"

আশ্বাস দিয়ে তাম্‌তি বললে—"ভয় পেয়ো না পিটোকিটি,

যতগুলো পার খুব শক্ত চাম্ড়া আর গাছের ছাল নিয়ে এস দেখি—"

কেন, কি বৃত্তান্ত, পিটোকিটি আর কিছুই জিগেস্ করলে না। কয়েক মিনিটেই এক রাশি চামড়া আর বাকল জড়ো হয়ে গেল।

চামড়া আর বাকলগুলো নিয়ে গিঁঠ বেঁধে বেঁধে প্রকাণ্ড একটা চাদর তৈরী করে তাম্তি বললে—"পিটোকিটি, তোমরা সবাই মিলে গাছের তলায় শক্ত করে এইটা টেনে ধর। তারপর যেমনি আমি ইসারা করব, যত জোরে পার সবাই মিলে একসঙ্গে চীৎকার করবে।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল। ঠিক তলায় পিটোকিটি আর দশ বারো জন নুচিকানু চামড়ার প্রকাণ্ড চাদরটা টেনে ধরে থাক্‌ল, আর একটু দূরে একরাশ ঢিল-পাটকেল জোগাড় করে তৈরী হয়ে দাঁড়াল তাম্তিরাম।

আমাকে ডেকে তাম্তি বললে—"আপনি কাছেই থাকবেন শিলুদা, মেয়েটা চাদরের ওপরে এসে পড়লেই তাড়াতাড়ি তুলে নেবেন।"

আমি বললাম—"কিন্তু—"

বাধা দিয়ে তাম্তি বললে—"দেখুনই না কি হয়।"

খপ্ করে দুহাতে দুটো ঢিল তুলে নিয়ে তাম্‌তি বললে—"চেঁচাও।"

বাপ্‌রে! সে কি বিকট চীৎকার। শ'খানেক মুচিকান্থু একসঙ্গে এমন উৎকট ভাবে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল যে কি আর বলব? সঙ্গে সঙ্গে তাম্‌তি ঢিল দুটো বাঁদরটার দিকে টিপ্ করে ছুঁড়ে মারলে।

হুঁক্‌সি ভোঁসা এতক্ষণ চুপ্‌টি করে আমাদের কাণ্ড কারখানা দেখছিল। হঠাৎ এ রকম বীভৎস চীৎকারে বেচারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। মুখ দেখেই বুঝলাম ভয়ানক ভয় পেয়েছে!

আরও দুটো পাথর তুলে নিয়ে তাম্‌তি হাঁক দিলে—"জোরে চেঁচাও।"

আবার আকাশ ফাটা চীৎকার। বিশ্রী মুখভঙ্গী করে তামতি আবার দুটো ঢিল বাঁদরটাকে ছুঁড়ে মারলে।

বার পাঁচ ছয় এমনি চল্‌ল। এক একবার চীৎকার ওঠে, তাম্‌তির হাতের ঢিল বাঁদরটার পাশ ঘেঁসে ছুটে যায় আর বেচারার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যায়, দেখে মনে হয় আর একটু হলেই কেঁদে ফেল্‌বে। কিন্তু নামবার নাম নাই, প্রাণপণে মেয়েটাকে আঁক্‌ড়ে বসে আছে। হঠাৎ এক তাজ্জব ব্যাপার ঘটে গেল। তাম্‌তি পাথর দুটো তার দিকে ছুঁড়ে মারতেই বাঁদরটা বিষম রেগে খ্যাক্ খ্যাক্ করে তেড়ে, নীচের দিকে

ঝুঁকে মেয়েটাকে দু'হাতে তুলে তাম্‌তির দিকে ছুঁড়ে মারলে।

মুচিকামুরা অসম্ভব রকম চীৎকার করে উঠ্‌ল। তাম্‌তির নির্দ্দেশ মতন এ চীৎকার নয়—এ চীৎকার ভয়ের।

মেয়েটার কিন্তু একটুও লাগ্‌ল না। সার্কাসে যেমন খেলোয়াড়েরা দড়ির জালের ওপরে এসে পড়ে তেমনি চাদরের ওপরে সে এসে পড়ল ঝপাৎ করে। ছুটে এসে যখন তাকে কোলে তুলে নিলাম, দিব্যি পিট্‌পিট্‌ করে তাকাতে লাগল।

ওঃ সে কি ভীষণ হট্টগোল। পিটোকিটি তাম্‌তিকে কাঁধে তুলেই নাচ্‌তে আরম্ভ করে দিলে। অন্য মুচিকামুগুলো এমন চীৎকার আর লাফালাফি করতে লাগল যে মনে হল আকাশই ভেঙে পড়ল বুঝি।

ঘরে ফিরে এসে যখন বস্‌লাম দেখি তাম্‌তি নিজের মনেই হাস্‌ছে। জিগেস্‌ করলাম—"কি হল আবার?"

বাস্‌! আর দেখে কে; গড়াগড়ি দিয়ে তাম্‌তি হেসে লুটিয়ে পড়ল—"বাপ্‌রে বাপ্‌! কি গালভরা নাম—হুঁক্‌সি ভোঁসা, আবার তার চার হাত চার পা। ওগুলো হাত কি পা, পিটোকিটি তাই ঠিক করতে পারেনি শিলুদা। হো হো হোঃ—পেটটা ফেটে গেল বুঝি!"

ফম্‌বোম্‌বোম্‌

একদিন কথায় কথায় পিটোকিটিকে জিগেস্‌ কর্‌লাম, "আমরা যে দিক দিয়ে এসেছিলাম, সে ধার ছাড়া আসা যায় না তোমাদের দেশে ?"

পিটোকিটি বল্‌লে, "না। এক শুধু সেনারা পারে। গ্রাম ছাড়িয়ে খানিক দূরে গেলে পাহাড়ের মধ্যে একটা ফুটো দিয়ে সরু রাস্তা আছে। সেটা শেষ হয়েছে আর একটা পাহাড়ের মাথায় এসে। তার পরেই আর যেতে পারবে না ; পাখীর মতন উড়্‌তে না পারলে আর যাবার উপায় নাই ওপারে। সে শুধু সেনারাই পারে।"

রাত্রে পিটোকিটি চলে গেলে আমি আর তাম্‌তি পরামর্শ কর্‌তে লাগ্‌লাম—ঐ সুরঙ্গ দিয়েই পালাতে হবে যত শীগ্‌গির পারা যায়।

এম্‌নি করে দিন কাটতে লাগল। পিটোকিটি আরও কয়েকজন সুচিকাসুর সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিলে।

সবারই মনে একই সন্দেহ আমরা মুবুঁবুঁনাসি, না সেনা !

সেনাপতি ব'লে পিটোকিটি লোকের কাছে খাতির ত' পেতই, তা' ছাড়া তরুণেরা যেন তাকে দলপতি বলে মেনে নিয়েছিল। কিছুদিন পরেই আমাদের ওপরে পাহারা বন্ধ হয়ে গেল ; পিটোকিটি বল্লে—"বুড়ো রাজা আর মন্ত্রিরা ছাড়া কেউ তোমাদের কিছু বল্‌বে না, কিন্তু পালাবার চেষ্টা করো না খবরদার। মহা বিপদ হবে তাহ'লে ; তখন আর আমি কিছুই কর্‌তে পার্‌বো না।"

পিটোকিটি, তার কয়েকজন সহচর, আমি আর তাম্‌তি একদিন নদীর ধারে বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ কি মনে হল, বল্লাম, "আচ্ছা, আমাকে যখন তোমরা ধরে নিয়ে আস্‌ছিলে তখন তোমার গলায় কি একটা ছিল না ? কি সেটা ?"

একটুখানি ভেবে পিটোকিটি বললে, "ও, সেটা আশিশি—"

আমি বল্‌লাম, "আশিশি ! সে আবার কি ?"

"আশিশি জানো না ? গলায় থাক্‌লে কখনও কোনও বিপদ হয় না। যখনই আমরা শিকারে কিংবা কোনও বিপদের কাজে যাই, আশিশি গলায় থাকে। কাছে কেউ আস্‌তে পারে না ভয়ে।"

জিগেস্ কর্‌লাম, "কোথায় পেলে ওটা ?"

"কেন ? ও-ত যত চাও পাওয়া যাবে—" তারপর সঙ্গীদের দেখিয়ে বল্‌লে—"এদের সবারই ত আশিশি আছে, কিন্তু আমার টাই সব চেয়ে বড়।"

তাম্‌তির দিকে ফিরে বাংলায় বল্‌লাম—"একটা চুনির মালা দেখেছিলাম এর গলায়। ডিমের মত বড় বড় চুনি।" তারপর আবার পিটোকিটির দিকে ফিরে বল্‌লাম, "কোথায় আশিশি পাওয়া যায় দেখাতে পারো আমাদের ?"

পিটোকিটি বল্লে, "তা পারি কিন্তু তুমি তাম্‌তিকে কি বল্লে আগে তা' বল। পালাবার মতলব কর্‌ছ না ত' ?

তাম্‌তি অট্টহাস্য করে উঠ্‌ল—"দূর, দূর পালাবো কোথায় তোমাদের ছেড়ে ? আমরা খালি এই বল্‌ছিলাম যে, দুটো আশিশি পেলে আমরাও নিতাম—কোন বিপদ আপদ হত না।"

পিটোকিটি নেহাৎ ভালোমানুষ; বল্‌লে, "এই কথা ? এ আর এমন শক্ত কি ? যত আশিশি চাও পাবে—চল।"

পিটোকিটির পেছনে পেছনে আমরাও চল্‌লাম আশিশির খোঁজে। আমাদের ঘরের পাশ দিয়ে নদী বয়ে গিয়েছিল পূর্ব্ব পশ্চিমে; তারই ধারে ধারে প্রায় এক মাইল গিয়ে হঠাৎ পিটোকিটি দক্ষিণ দিকে বেঁকে চল্‌ল। নদী পেছনে ফেলে কয়েক মিনিট দক্ষিণ মুখে চলার পরই সমান মাটি ছেড়ে পাহাড়ে

উঠ্‌তে লাগ্‌লাম। রাস্তা খুব চড়াই নয়, গাছপালায় ঢাকা, এঁকে-বেঁকে গিয়েছে।

পিটোকিটি একেবারে চুপ করে আগে আগে চল্‌ছিল। আমাদেরও তখন কথা কইবার মত মনের অবস্থা ছিল না। শুধু মনে হচ্ছিল না জানি কি দেখ্‌ব; পিটোকিটির গলার মালার মতন একটা চুনি পেলেই ত লক্ষ টাকা।

হঠাৎ তাম্‌তি বল্‌লে—"ওটা কি পিটোকিটি?" তার কথায় মুখ তুলে তাকিয়ে আমিও দেখ্‌লাম, অনেকটা দূরে চারিধারে ঘেরা উঁচু পাহাড়ের মাঝখানে একটুখানি সমান জায়গা। তাও আবার চারিধারে বাঁশের বেড়া দিয়ে তাকে আরও ছোট্ট ক'রে দেওয়া হয়েছে।

তাম্‌তির প্রশ্নে পিটোকিটি অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ফিরে তাকাল। মুখ ভার করে বল্‌লে—"তাকিও না ওদিকে।"

তাম্‌তি হতভম্ব হয়ে গেল; আবার কি জিগেস্ কর্‌তে যাচ্ছিল আমি ইসারায় মানা কর্‌লাম।

আরও খানিকটা উঠেই পিটোকিটি থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। একটু দূরে আঙুল দেখিয়ে বল্‌লে—"সুয়াগা, ঐ ছ্যাখো।"

জীবনে আর কখনও এমন অবাক্ হই নি। কয়েক পা দূরেই অনেকখানি জায়গা জুড়ে পাহাড়ের ওপরে একটা বাটির

মতন হয়ে গিয়েছে, আর তার মধ্যে ছড়ান হাজার হাজার টক্‌টকে চুনি। মটরের মত থেকে আরম্ভ করে প্রায় পিটৌকিটির গলায় মালার মত হাজার হাজার চুনি ঝক্‌ঝক্ কর্‌ছে।

হাতে করে তুলে, নেড়ে চেড়ে আমি আর তাম্‌তি দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। আহ্লাদে যে পাগল হ'য়ে যাইনি এই আশ্চর্য্য ! এখন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে সব।

আমাদের রকম-সকম দেখে অবাক্ হয়ে পিটৌকিটি বল্‌লে —"অমন কর্‌ছ কেন ? যত চাই নাও না তুলে।"

ভালো ভালো বেছে বেছে দুজনে আমরা যতগুলো পার্‌লাম তুলে নিলাম। উঠে দাঁড়িয়ে তাম্‌তি বল্‌লে,—"আজ চল, আবার আসা যাবে একদিন।"

হঠাৎ যেন আকাশ ভেঙে বাজ পড়্‌ল—হাঃ ! হাঃ ! হাঃ ! লাফিয়ে উঠে দেখি গাছের ডালে একটা সুচিকানু আমাদের দিকে তাকিয়ে অট্টহাসি হাসছে। আমাদের চোখে চোখ পড়্‌তেই বাঁদরের মত তর্‌তর্ করে গাছ থেকে নেমে দেখ্‌তে দেখ্‌তে জঙ্গলে লুকিয়ে পড়্‌ল।

পিটৌকিটির দিকে ফিরে দেখি ভয়ে তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে। একটু ভয়ে ভয়ে আমিও বল্‌লাম—"ব্যাপার কি পিটৌকিটি ?"

প্রথমে ও কথা কইলে না। একটু পরে নিজেকে যেন সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লে—“জানি না। তোমাদের নিয়ে এখানে এসেছি, এ খবর বুড়ো রাজার চর কেমন করে পেলে! বিপদ ঘট্‌বে এবার।”

তাম্‌তি বল্‌লে—“কেন, অন্যায় ত কিছু করি নি। দুটো পাথর নিতে দোষ কি?”

“চল চল যা হবার হবে। বেশীক্ষণ থাক্‌তে হবে না এখানে।”

সমস্ত রাস্তা মাথা নীচু করে পিটোকিটি অতি বিমর্ষমনে চল্‌তে লাগল। আমাদেরও বুক্ দুর্ দুর্ করতে লাগল ভয়ে—না জানি অদৃষ্টে কি আছে!

গ্রামে ফিরে এসে দেখি হৈ-হৈ ব্যাপার। পিটোকিটিকে দূর থেকে দেখে একদল নুচিকানু তাকে ঘিরে ধর্‌লে। এত-গুলো লোক কথা কইতে আরম্ভ কর্‌লে এক সঙ্গে যে কারও কথা বোঝা যায় না।

—কেন নিয়ে গেলে ওদের?

—সর্ব্বনাশ হল পিটোকিটি।

—বুড়ো রাজা তোমাকে ফম্‌বোম্‌বোম্ কর্‌বে।

আমি আর তাম্‌তি হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাক্‌লাম।

বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হ'ল না। রাজার একদল রক্ষী এসে আমাদের তিনজনকে নিয়ে চল্‌ল।

সভা লোকে লোকারণ্য ; যে যেখানে ছিল সব বোধ হয় এসে জুটেছে। পিটোকিটি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে, আর তার দুপাশে আমরা দুজনে ; বুকের ভিতরে হাতুড়ি পিট্‌তে লেগেছে —না জানি কি হবে !

খানিকক্ষণ একদৃষ্টে আমাদের দিকে তাকিয়ে রাজা গর্জ্জন করে উঠ্‌লেন—"নুচিকানুর দেশ থেকে আশিশি চুরি করতে এসেছিস্ ? দেখ্‌ব এবার কে বাঁচায় ? সেনা কি নুবুঁবুঁনাসি কেউ পালাতে পারে না ফম্‌বোম্‌বোমের কাছ থেকে।"

সে কি বীভৎস মুখ ! দেখ্‌লেই প্রাণ আতঙ্কে কেঁপে ওঠে। পিটোকিটির দিকে আঙুল বাড়িয়ে রাজা চাপা স্বরে যেন বিষ উগ্‌রে বল্‌তে লাগল—"আর তোকে কে বাঁচাবে শয়তান ? বন্ধুর সঙ্গে তুইও যাবি ফম্‌বোম্‌বোমের কাছে।"

বিচার শেষ হয়ে গেল। রক্ষীরা আমাদের নিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিলে। পিটোকিটির বন্ধুবান্ধব কেউ আর আসতে পেলে না ত্রিসীমানায়, দুয়োরের কাছে বর্শার বহর দেখে সবাই পালিয়ে গেল।

খানিক পরে আমি বললাম, "কি ব্যাপার পিটোকিটি ? বুড়ো রাজা অত রেগে গেল কেন ?"

বেচারা বোধ হয় গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদছিল। ধরা গলায় বললে—"জানি না। আশিশি আন্‌তে গেলে যে মরতে হবে

কেউ বলে নি আমাকে।” তারপর বিরক্ত হয়ে আমাদের দিকে পিছন ফিরে বলে উঠ্ল—“হায়, হায়, তোমাদের বাঁচিয়ে আজ নিজেই চল্লাম ফম্বোম্বোমের কাছে।”

ফিরে দেখি তাম্তিরাম অত্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে ছোট ছোট চুনি গুলোকে কোট আর পেণ্টুলুনের পকেটে পুরে, বড় বড় গুলো একটা চামড়ায় জড়িয়ে বাঁধছে। বিরক্ত হয়ে বল্লাম —“ফেলে দে সব। ওগুলোই যত অনিষ্টের মূল।”

এক গাল হেসে দাঁত বের করে ভূতটা উত্তর দিলে—“বলেন কি দাদাবাবু? হাতের লক্ষ্মী কি পায়ে ঠেলে ফেলে দেয় কেউ? অত ভয় পাচ্ছেন কেন, দুটো পিস্তল সঙ্গে থাকতে ভয় কি?”

রাতটা যে কেমন করে কাট্ল বুঝতেই পারছ। পিটোকিটি সেই যে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে বস্ল আর নড়াচড়া নাই। তাম্তি দিব্যি হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে বল্লে—“বসে থেকে কি হবে, শুয়ে পড়ুন না।”

সকাল হতেই শুনতে পেলাম ঘরের বাইরে আশে-পাশে, সারা গ্রামে মহা হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছে, কিন্তু আমাদের কেউ এসে কিছু বল্লে না। বাইরে হট্টগোল ক্রমশঃ বাড়তে লাগ্ল,

অনেক লোক এক জায়গায় জড়ো হলে যেমন হয়। ঘরে বসে আমরা শুন্‌তে লাগলাম আর ভাব্‌তে লাগলাম, না জানি আরো নূতন কি ঘটে!

পিটোকিটির চোখ দুটো রক্তজবা, চুলগুলো জট পাকানো, সারা মুখে যেন কে কালী লেপে দিয়েছে। মুখে একটা কথা নাই, বেচারা ভয়ে একেবারে আধমরা।

বাইরে হট্টগোল থামে না। মনে হল যেন আমাদের ঘরের পাশ দিয়েই দলে দলে লোক চলেছে। প্রায় আধঘণ্টা পরে আট দশটা রক্ষী এসে আমাদের বাইরে নিয়ে গেল। চারিধারে চেয়ে দেখি কেউ কোথাও নাই—গ্রামশুদ্ধ লোক কোথায় উধাও।

একটু পরেই রওনা হলাম। প্রথমে পিটোকিটি তারপর আমি আর তাম্‌তি; আগে পেছনে পাহারা। পিটোকিটির মুখে কথা নাই যেন একেবারে মাটির পুতুল। আমি বললাম, "লোকগুলো সব গেল কোথায় তাম্‌তি?"

—"কে জানে। বোধ হয় তামাসা দেখবে বলে আগে থাকতেই ছুট দিয়েছে।"

যে পথে আগের দিন চুনির খোঁজে গিয়েছিলাম সেই রাস্তায় এঁকে বেঁকে পাহাড়ে উঠ্‌তে লাগলাম। খানিক পরেই তাম্‌তি বল্‌লে—"ঐ দেখুন চেয়ে—"

চেয়ে দেখি পাহাড়ের মাঝখানে বাঁশের বেড়া ঘেরা ছোট্ট

যে জায়গাটা আগের দিন দেখেছিলাম,-তারই চারিধার লোকে লোকারণ্য! বললাম, "এই খানেই তাহলে আমাদের সাজা দেওয়া হবে তাম্‌তি।"

—"হুঁ! দেখা যাবে একবার কম্‌বোম্‌বোম্‌কে॥"

ঘুরে ঘুরে নীচে নাম্‌তে লাগ্‌লাম। আমাদের দেখ্‌তে পেয়ে যারা তামাসা দেখ্‌তে এসেছিল তারা বিষম কোলাহল জুড়ে দিলে। বর্শা হাতে আরও কয়েকটা রক্ষী এগিয়ে এসে আগু বাড়িয়ে নিয়ে চল্‌ল আমাদের।

চারিধারে উঁচু খাড়া পাহাড়। তারই গা দিয়ে একপাশে খাঁজ কেটে একটা সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়েছে। নীচে যে টুকু সমান জায়গা, তারই মধ্যে আবার তিন ধারে খুব শক্ত বাঁশের বেড়া দেওয়া; আর একধারে বেড়াটা লম্বা করে টেনে নিয়ে জুড়ে দিয়েছে একেবারে পাহাড়ের গায়ে একটা সুরঙ্গের মুখে। সুরঙ্গের মুখে খুব মোটা মোটা কাঠের শক্ত একটা ঝাঁপ কষে বাঁধা; তার ওপর আবার কয়েকটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর চাপা দিয়েছে।

আমাদের তিন জনকে নীচে নিয়ে গিয়ে বেড়ার মধ্যে একটা ঝাঁপ টেনে খালি জায়গাটার মধ্যে ঠেলে দিয়ে বর্শা হাতে রক্ষীগুলো বেড়ার ওপরে দাঁড়িয়ে থাক্‌ল। কয়েকটা জোয়ান্ জোয়ান্ লোক ছুটে এসে সুরঙ্গের মুখের ভারী পাথর

গুলো ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দিলে। তারপরে একটানে ঝাঁপটা খুলে ফেলে দিয়েই প্রাণপণে দৌড়ে পালাল। হাত পঁচিশেক খোলা জায়গাটার মাঝখানে আমরা তিনজন দাঁড়িয়ে থাকলাম স্থরঙ্গটার দিকে চেয়ে।

বাঁশের বেড়াটার আড়ালে হঠাৎ কতকগুলো মশাল জ্বলে উঠ্ল। ওপরে লোকে লোকারণ্য, সবাই ঝুঁকে দেখছে আমাদের। ঠিক মাঝখানে বুড়ো রাজা আর তাঁর কয়েকজন মন্ত্রী—মুখে তাদের সে কি হিংস্র আনন্দ।

কয়েক মিনিট কেটে গেল। চুপ করে তিনজন দাঁড়িয়ে আছি, স্থরঙ্গটার ভেতর থেকে কি যে ছুটে আসবে কে জানে। পিটোকিটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থর্থর্ করে কাঁপছে—মুখটা তার ভয়ে একেবারে ফ্যাকাসে। হঠাৎ তাম্তি বলে উঠল—"তবু ভাগ্যি ভালো যে পিস্তল দুটো সঙ্গে আছে, এতদিন এরা কেড়ে নেয় নি। তারপর কোটের তলে হাত ঢুকিয়ে কোমর থেকে একটা পিস্তল খুলে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বল্লে,— "তৈরী হয়ে থাকুন্। যতক্ষণ পারি লড়ে দেখবো।"

তাম্তির মুখের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই ভীষণ আর্ত্তনাদ করে পিটোকিটি মাটিতে লুটিয়ে পড়্ল! চেয়ে দেখি স্থরঙ্গটার ভেতর থেকে অতি মন্থর গতিতে এঁকে বেঁকে প্রকাণ্ড একটা অজগর ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে। চোখ দুটো সবুজ মণির

মতন জ্বল্‌জ্বলে, থ্যাবড়া মুখের ভেতর থেকে চেরা জিভ্‌টা লক্‌লক্ করে ছুটে এসে আবার তখুনি স্প্রিংয়ের মতন লুকিয়ে যাচ্ছে।

পিটোকিটি লুটিয়ে পড়তেই পাহাড়ের ওপরে লোকগুলো সমস্বরে চীৎকার করে উঠ্‌ল—"মুয়াগা, মুয়াগা, ফম্‌বোম্‌বোম্।"

অতি ধীরে ধীরে লতিয়ে লতিয়ে সাপটা আস্‌তে লাগ্‌ল জ্বলজ্বলে চোখে আমাদের দিকে চেয়ে। পেছন ফিরে দেখলাম বুড়ো রাজার রক্ষীর দল মশাল আর বর্শা হাতে বেড়াটার চারিধারে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সে দিক দিয়ে যে পালান যাবে অসম্ভব। অজগরটা পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে একেবারে পিষে মেরে ফেল্‌বে, আমাদের চীৎকারে চারিধার কেঁপে উঠ্‌বে আর ওপর থেকে অসভ্যগুলো তামাসা দেখবে আর চেঁচাবে।

সাপটার চোখছুটোর দিকে চেয়ে আমার হাত পা যেন অবশ হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। হঠাৎ চারিধার কাঁপিয়ে তাম্‌তির পিস্তল গর্জ্জে উঠ্‌ল—গুড়ুম্! সঙ্গে সঙ্গে এক নিমিষে যেন কি মন্ত্রের বলে পাহাড়ের ওপরে সমস্ত হট্টগোল থেমে গেল। তারা যে তখন কি করছে দেখবার সময় ছিল না। তাম্‌তি পিস্তল ছুঁড়তেই আমারও অবশ ভাব যেন কেটে গেল, আমিও পাগল হয়ে আরম্ভ করলাম গুলি চালাতে। প্রথম ছুটো গুলি খেয়েই অজগরটা লাফিয়ে উঠেছিল তারপর গুলির পর-গুলিতে

আমিও পাগল হয়ে আরম্ভ করলাম গুলি চালাতে

—পৃঃ ৫৬

জর্জ্জরিত হয়ে লুটোপুটি করতে করতে আছড়ে মরতে লাগ্‌ল। মিনিট কয়েক পরেই একেবারে সব ঠাণ্ডা।

ফিরে তাকিয়ে দেখি পাগলের মতন ফ্যাল্‌ফেলে চোখে পিটোকিটি তাকিয়ে আছে। বেড়ার পেছনে রক্ষীর দল কখন ছুট দিয়েছে প্রাণভয়ে, আর ওপরে লোকগুলো একেবারে ভয়ে কাঠ।

পিটোকিটির কাঁধে হাত দিয়ে বল্‌লাম, "আর ভয় নাই, তোমার বন্ধুদের ডাকো এবার।"

একগাল হেসে তাম্‌তি বল্‌লে—"হ্যাঁ; বুড়ো রাজা আর কিছু বল্‌বে না, নইলে ফম্‌বোম্‌বোমের মত দেব উড়িয়ে।"

পিটোকিটি ভয়ে ভয়ে আমাদের দিকে তাকাতে লাগল। তারপর অতি ধীরে ধীরে বললে—"শিলু-তাম্‌তি?" তার গায়ে হাত দিয়ে বললাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি শিলু আর ঐ তাম্‌তি। কোনও ভয় নাই তোমার, ফম্‌বোম্‌বোম্ আর কিছু কর্‌তে পার্‌বে না।"

ভয়ে ভয়ে পিটোকিটি মরা অজগরটার দিকে তাকিয়ে দেখল, গুলিতে ছিন্ন ভিন্ন চেহারা, রক্তে আর মাটিতে লুটো-পুটি খাচ্ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেমন যেন বদলে গেল তার মুখের ভাব। ঘোলাটে চোখ দুটো ক্রমশঃ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, নুয়ে পড়া শরীরটা সোজা উঠে দাঁড়াল। শক্ত করে

আমার হাত দুটো চেপে ধরে বল্‌লে—"তোমরা আমাকে বাঁচিয়েছ শিলু; যেদিন বল্‌বে তোমাদের জন্যে মরবো আমি।"

সোজা হয়ে পিটোকিটি উঠে দাঁড়াল আবার সেই আগের মতই বীর সেনাপতির ভঙ্গীতে। ওপর দিকে চেয়ে চীৎকার করে ডাকলে—"ফম্‌বোম্‌বোম্ আঁসোঁমাসিনাই, পিটোকিটি নাঁসিসোঁমাই, বুঁদেদে বুঁদেদে।" তার মানে "ফম্‌বোম্‌বোম্ মরেছে, পিটোকিটি মরেনি, ছুটে আয়, ছুটে আয়।"

পিটোকিটির সঙ্গীরা বোধ হয় এতক্ষণ ভাবছিল যে ও মরে গিয়েছে কারণ তার গলার স্বর শুনেই আহ্লাদে সবাই চীৎকার করে উঠল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে ছুটে এসে ঝাঁপ খুলে আমাদের তিন জনকে ওপরে নিয়ে গেল মহোল্লাসে হৈ-হৈ কর্‌তে কর্‌তে।

চেয়ে দেখ্‌লাম বুড়ো রাজা আর মন্ত্রীরা রক্ষীদের নিয়ে চুপি চুপি ফিরে চলেছে, কারও মুখে একটি কথা নাই। লোক-গুলোও সব হতভম্ভ,—কি যে করবে জানে না। আমাদের দূরে রেখে সবাই একে একে সরে পড়ল, যেন আমরা সাক্ষাৎ যম কি তারও বেশী।

শিলুরা পালাল

গ্রামে ফিরে এলাম। পিটোকিটি আর তার সঙ্গীরা ছাড়া সবাই ভয়ে ভয়ে আমাদের এড়িয়ে চলতে লাগল আর রক্ষী-গুলোও একেবারে দূর হয়ে গেল কাছ থেকে।

এমনি করে দিন দুই কাটার পর একদিন সকালে পিটোকিটি কিংবা তার সঙ্গীরা কেউ এল না। সারা দিন কেটে গেল, বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা এল তবু কারও দেখা পেলাম না। অজগরটা মারার পর থেকে কোনও শুচিকানু কাছেই আস্‌ত না, কাউকে যে জিগেস্ করবো তারও উপায় নাই।

সন্ধ্যা হল। মাথার ওপরে চাঁদ উঠ্‌ল। নদীর ধারে আমি আর তাম্‌তি বসে বসে বলাবলি করছি—কি হল পিটোকিটির, এমন সময় দেখি পিটোকিটি আসছে। কাছে আসতেই বললাম—“কি খবর? আজ একেবারে দেখা নাই যে?”

পিটোকিটি কোনও উত্তর দিলে না। চাঁদের আলোয় দেখলাম মুখখানা থম্‌থমে। আমাদের কাছে বসে পড়ে খুব নীচু স্বরে বললে—"বুড়ো রাজার কাছে ছিলাম।"

তাম্‌তি হেসে উঠ্‌ল—"আবার কি হল? আরও ফম্‌বোম্‌বোম্‌ আছে না কি রাজার?"

খুব ভারী গলায় পিটোকিটি জবাব দিলে—"হেসো না, হাসবার কথা নয়।" তারপর চারিধারে কেউ কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে কি না দেখে নিয়ে গলাটা আরও একটু খাটো করে বললে—"তোমরা বাজ দিয়ে ফম্‌বোম্‌বোম্‌কে মারার পর থেকেই বুড়ো রাজা আর মন্ত্রীরা বলছে যে, তোমরা নুবুঁবুঁনাসি নও। ফম্‌বোম্‌বোমের কাছ থেকে কেউ পালাতে পারে না, তাকে মারা ত দূরের কথা। হয় তোমরা সেনা, নয় আরও কিছু কিন্তু নুবুঁবুঁনাসি কক্ষণও না। রাত কেটে গেলে হাত পা বেঁধে তোমাদের পাহাড় থেকে গড়িয়ে ফেলা হবে ঐ নদীর জলে। যদি সেনা হও পাখী হয়ে উড়ে যাবে আর না হলে মর্‌বে—বাজ দিয়ে আর কিছু করতে পারবে না।"

আমি বল্‌লাম—"আর তোমার কি হবে?"

"আমার কিচ্ছু হবে না। ফম্‌বোম্‌বোমের কাছ থেকে বেঁচে গিয়েছি বলে বুড়ো রাজা বল্‌ছে যে আমার আশিশি খুব ভালো। আর তা ছাড়া আমাকে কিছু কর্‌লে হয় ত' নুচিকানুরা

পিছনে ওরা সবাই চীৎকার করে উঠল

-পৃঃ ৬৭

এবার গোলমাল কর্‌বে, তাই রাজা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। তোমরা মর্‌বে কাল।"

তাম্‌তি বল্‌লে—"মর্‌বো কেন, পালানো যাবে না?

পিটোকিটি চম্‌কে উঠ্‌ল—"কোথায় পালাবে? আর তোমাদের পালাবার রাস্তা দেখিয়ে দেবে কে?"

আমি বল্‌লাম—"কেন, তুমি। তোমাকে আমরা ফম্‌বোম্‌-বোমের কাছ থেকে বাঁচিয়েছি, আর আমরা জলে ডুবে মর্‌বো তুমি কিছুই কর্‌বে না?"

পিটোকিটি আরও কাছে সরে এল। গাঢ় স্বরে বল্‌লে—"তোমাদের সঙ্গে আমিও মর্‌তে পারি শিলু, কিন্তু কি কর্‌বো বল? 'মু' থেকে যে পালাতে পারা যায় না এক পাখী না হলে।"

বল্‌লাম—"সেই যে পাহাড়ের মধ্যে একটা ফুটো দিয়ে রাস্তার কথা বলেছিলে?"

"সেটা দিয়ে যাবে কেমন করে? একে ত গ্রাম ছেড়ে পালানই মুস্কিল, তারপর যদি বা কোনও রকমে পারো, সে ফুটো পার হয়ে ওপারে যেতে পারবে না—যাবার কোনও উপায় নাই একেবারে।"

তাম্‌তি এতক্ষণ চুপ্ করে ছিল। এইবার বল্‌লে—"না থাকে নাই। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে মর্‌বো তবু জলে

ডুবে মরতে রাজী নই। তুমি আমাদের রাস্তাটা দেখিয়ে দাও তারপর যা করবার আমরা কর্‌বো।”

অনেকক্ষণ পিটোকিটি চুপ করে থাক্‌ল। তারপর খুব গম্ভীর ভাবে বল্‌লে—“তাই হবে শিলু। সবাই ঘুমোলে আমি আস্‌বো, নিয়ে যাবো পথ দেখিয়ে।”

পিটোকিটি চলে গেল। আমি আর তাম্‌তি ঘরে ফিরে এলাম। রাশি করা চাম্‌ড়ার মধ্যে বার দুই হাতড়ে বিবর্ণমুখে তাম্‌তি বল্‌লে—“সর্ব্বনাশ হল শিলুদা! পিস্তল দুটো কে সরিয়ে নিয়েছে। কাল আনমনে এখানেই রেখেছিলাম—অত খেয়াল করিনি। কি হবে এবার ?—”

বল্‌লাম—“কি আর হবে ? যা কপালে আছে কেউ আট্‌কাতে পারবে না তাম্‌তি।

রাত্রি অনেক গভীর হ’ল। আশে পাশের ঘরগুলোতে সুচিকানুদের সাড়া-শব্দ সব থেমে গেল একেবারে। আমি আর তাম্‌তি কান খাড়া করে বসে, কখন পিটোকিটি আসে।

বসে বসে হয় ত ঢুল্‌তে আরম্ভ করেছিলাম হঠাৎ কে গায়ে হাত দিলে। চম্‌কে উঠে দেখি তাম্‌তি আর পিটোকিটি হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে। কানের কাছে মুখ নিয়ে

গিয়ে পিটোকিটি বল্‌লে—"শব্দ কোরো না, এসো আমার সঙ্গে।"

চাঁদের আলোয় নদীর জল ঝিক্‌মিকিয়ে উঠেছে। আমি, তাম্‌তি আর পিটোকিটি চলেছি পা টিপে টিপে। পিটোকিটির হাতে বর্শা, তাম্‌তির কোমরে চুনির থলে, আমি খালি হাতে।

নদীর পাড় ছেড়ে পাহাড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লাম। চাঁদের আলোয় গাছের ছায়াগুলো দেখে হঠাৎ মনে হয় কে যেন চুপ্ করে দাঁড়িয়ে আছে। থম্‌কে থম্‌কে দাঁড়িয়ে চারিধার দেখে পিটোকিটি এগিয়ে চল্‌ল—আমরাও চল্‌লাম তার পেছনে।

প্রায় আধ মাইল এসেছি এমন সময় পেছন দিকে হঠাৎ তাকিয়ে পিটোকিটি চেঁচিয়ে উঠল—"পালাও, পালাও, আর রক্ষে নাই।" ফিরে তাকিয়ে দেখি দূরে অনেকগুলো মশাল জ্বলে উঠেছে।

কথায় বলে প্রাণের দায় বড় দায়। তীরবেগে আমরা তিনজন ছুটতে লাগ্‌লাম—পেছনে যারা আস্‌ছিল তারাও চীৎকার করে দৌড়াতে আরম্ভ করে দিলে। ছুট্‌তে ছুট্‌তে পিটোকিটি দূরে আঙুল দেখিয়ে বল্‌লে—"ঐ পাহাড়ে ফুটো। তোমরা পালাও, আমি আট্‌কাবো এদের।"

অবাক্ হয়ে বল্‌লাম—"একলা তুমি পারবে কেন? এস পালাই একসঙ্গে—"

আমাকে ঠেলে দিয়ে পিটোকিটি বল্‌লে—"দেরী কোরো না যাও, যাও। যতক্ষণ পারি লড়্‌বো, তারপর মর্‌বো তোমাদের জন্যে।"

পিছনে লোকগুলো ছুটে আস্‌ছে। পাহাড়ের গায়ে একটা অন্ধকার সুরঙ্গ বসে আছে ওৎ পেতে। আগে পেছনে না দেখে আমি আর তাম্‌তি তীরবেগে ঢুকে পড়্‌লাম। ওর মধ্যে বাঘ কি সাপ আছে, সে কথা ভাববার সময় তখন কই?

অন্ধকারের মধ্যে ছুটে যেতে পার্‌লাম না, পাহাড়ের গা ধরে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে চল্‌তে লাগ্‌লাম। সুড়ঙ্গের মুখ থেকে পিটোকিটি চেঁচাতে লাগ্‌ল—"শিগ্‌গির পালাও, শিগ্‌গির পালাও—ওরা এসে পড়্‌ল!"

হোঁচট্ খেতে খেতে যত তাড়াতাড়ি পারি চল্‌তে লাগ্‌লাম। শুন্‌তে পেলাম মুচিকানুরা চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে আরও কাছে ছুটে আস্‌ছে। তাম্‌তি আগে আগে যাচ্ছিল, হঠাৎ বল্‌লে—ঐ চাঁদের আলো, আর একটু গেলেই খোলা জায়গা পাবো। তাম্‌তির কথা স্পষ্ট শুন্‌তে পেলাম না, সুড়ঙ্গের মুখ থেকে মুচিকানুদের চীৎকারে সব ডুবিয়ে দিলে।

সুড়ঙ্গ থেকে বার হয়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। যতদূর চোখ যায় পাহাড়ের পর পাহাড়। ঠিক আমাদের পায়ের কাছ থেকে প্রকাণ্ড একটা ঢালু নেমে গিয়ে একেবারে শেষদিকে

আবার একটু উঁচু হয়ে উঠেছে। সেটা হয়ত বা কোনও রকমে প্রাণ হাতে করে নামা যায়, কিন্তু তারপরে আর পালাবার পথ কই? পাহাড়ের পর পাহাড় যে বেড়াজাল পেতে রেখেছে, তা' ডিঙ্গিয়ে যাবার রাস্তা নাই। মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা খাদ হাঁ করে আছে—এপার থেকে ওপারে যেতে হলে উড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাত খাদটা লাফ দিয়ে পার হওয়া একেবারে অসম্ভব—একেবারে সোজা পাতালের রাস্তা।

বল্লাম—"তাম্তি এবার উপায়?"

"উপায় আর কি? খাদটা ডিঙিয়ে যেতে পারলেই খালাস।"

এত দুঃখেও হাসি এল, বল্লাম—"তা বটে কিন্তু ডানা যে নাই!"

তাম্তি কোনও উত্তর দিলে না। আশে পাশে অনেকগুলো পাথর পড়ে ছিল তারই মধ্যে বেশ বড় একটা বেছে নিয়ে ঠেলে গড়িয়ে দিলে। প্রথমে অতি ধীরে ধীরে তারপর একটু করে বেগ বাড়তে বাড়তে শেষে বিদ্যুৎগতিতে পাথরটা ছুটে চল্ল। সমস্ত ঢালুটা পেরিয়ে একেবারে খাদের মুখে এসে সোজা লাফিয়ে উঠল। তারপর পলক পড়তে না পড়তে খাদটা ডিঙ্গিয়ে পার হয়ে ওপারে সমান জায়গাটায় গিয়ে গড়াতে গড়াতে থেমে গেল।

এতক্ষণ তাম্‌তি একদৃষ্টে পাথরখানার দিকে তাকিয়ে ছিল। এবার মুখ তুলে বল্‌লে—"আমরাও যাবো এম্‌নি করে।"

লাফিয়ে উঠে বল্‌লাম—"ক্ষেপেছিস্‌! গুঁড়ো হয়ে যাবো একেবারে—"

"না হবো না! আমরা চেপে ধরে থাকলে পাথরখানা আর গড়িয়ে যেতে পারবে না, এই ঢালু দিয়ে পিছলে যাবে।"

সুড়ঙ্গের মুখ থেকে সুচিকামুরা জয়ধ্বনি করে উঠ্‌ল। পিটোকিটির শেষ আর্ত্তনাদ ভেসে এল কাণে—"পালাও,পালাও আমি আর পারছি না"—তার পরেই সব চুপ্‌। বেচারা আমাদের জন্যেই জাত-ভাইএর হাতে প্রাণ দিলে।

মশালের আলোয় সমস্ত সুড়ঙ্গটা ভাসিয়ে দলে দলে রক্ষী-গুলো ছুটে আস্‌তে লাগ্‌ল। প্রকাণ্ড একটা পাথরের কাছে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে তাম্‌তি তার ওপরে উপুড় করে আমাকে শুইয়ে দিয়ে বল্‌লে—"ধরুন্‌ শক্ত করে, প্রাণ গেলেও ছাড়্‌বেন না যেন।" তারপর আমার পাশে যেটুকু জায়গা ছিল তারই মধ্যে কোনও রকমে নিজে উপুড় হয়ে পড়ে বলে উঠ্‌ল—"আমি বল্‌লেই পা দিয়ে যত জোরে পারেন ঠেলে দেবেন।"

সুচিকামুদের মশালের আলোয় চারিধার রাঙা হয়ে উঠ্‌ল—এই বুঝি ধরে ধরে! চীৎকার করে তাম্‌তি বল্‌লে—'এইবার—'

বাস্‌! দুজনের পায়ের ঠেলায় পাথরখানা নড়ে উঠল,

তারপরেই সোজা ছুটে চল্‌ল ঢালু বেয়ে। পিছনে ওরা সবাই চীৎকার করে উঠল, বোধ হয় ভয়ে আর বিস্ময়ে।

প্রতি মুহূর্ত্তে পাথরটার গতি বেড়ে চল্‌ল। শেষে যখন তীর বেগে ছুটতে লাগ্‌ল, আমি ভয়ে চোখ বুঁজলাম। হঠাৎ মনে হল যেন মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ে চলেছি তারপরেই মাথাটা ঘুরে উঠ্‌ল—আর কিচ্ছু মনে নাই।

কতক্ষণ পরে জানি না, চোখ চেয়ে দেখি মাটিতে সটান্ শুয়ে আছি, আর তাম্‌তিরাম একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে। আমাকে চাইতে দেখেই বল্‌লে—"লেগেছে কোথাও ?"

নড়ে চড়ে উঠে বস্‌লাম ; হাত পা কিছুই ভাঙেনি। তাম্‌তি হেসে বল্‌লে—"দেখুন না একবার ওদিকে—"

পেছন ফিরে দেখি খানিকটা দূরেই অতল খাদ। তার মুখ থেকে প্রকাণ্ড ঢালু উঠে গিয়েছে সোজা ওপারে পাহাড়ের মাথায় আর সেইখানে তখনও মশাল জ্বালিয়ে কতগুলো সুচিকানু দাঁড়িয়ে আছে।

তাম্‌তি উঠে দাঁড়াল। হাত পা নেড়ে চীৎকার করে বল্‌লে—"ফম্‌বোম্‌বোম্ ধর্ দেখি এবার।" ওপারে ওরা

শুন্‌তে পেল কি না জানি না, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মশাল আর বর্শা নিয়ে আস্ফালন করে শেষে হতাশ হয়ে ফিরে চলে গেল। প্রকাণ্ড একটা নিশ্বাস ফেলে তামৃতি বল্‌লে—"যাক্, হাঙ্গামা মিট্‌ল এবার।" ধন্য সাহস ওর; বিপদ যতই হোক্, মুখে হাসি-ঠাট্টা লেগেই আছে।

বাকী রাতটা পাহাড়ের ওপরেই কাটিয়ে দিলাম। ভাগ্যি ভালো যে বাঘ ভালুকে খায় নি। সকাল হতেই গাছ-পালা আর জঙ্গল ভেঙ্গে চল্‌লাম দুজনে। খানিক দূর গিয়ে একটা ঝর্ণার শব্দ কানে আস্‌তেই বল্লাম—"চল্ তামৃতি, একটু জল খাওয়া যাক্ তারপর যা হবার হবে। কপালে যদি থাকে কারো দেখা পাবো নইলে মরবো এখানেই দু'জনে।"

ঝর্ণার শব্দ লক্ষ্য করে চল্‌লাম। হঠাৎ একটা গাছের আড়ালে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম দু'জনে। কাছেই কোথা থেকে গ্রামোফোনের শব্দ ভেসে আস্‌ছে।

তামৃতি লাফিয়ে উঠ্‌ল,—"গ্রামোফোন যখন বাজ্‌ছে মানুষ—আমাদেরই মতন মানুষ—আছে নিশ্চয় কোনওখানে।" পাগলের মতন ঝোঁপঝাঁপ ভেঙ্গে এগিয়ে এসে দেখি, পাহাড়ের ধারে রেলিঙ্ দিয়ে ঘেরা একটা সমান জায়গায় দিব্যি সতরঞ্চি পেতে একদল কাচ্চা-বাচ্চা হট্টগোল কর্‌ছে, আর দূরে ঝর্-ঝর্ করে ঝরে পড়ছে প্রকাণ্ড একটা ঝর্ণা।

তারপর আর কি! কাচ্ছা-বাচ্ছাগুলো আমাদের দেখে চেঁচিয়ে উঠ্ল। অরিন্দম বাবু আর তাঁর বাড়ীর মেয়েরা কাছেই কোথায় ছিলেন, ছুটে এলেন। আমাদের নিয়ে সে কি জেরা। কেউ বলে পাগল, কেউ বলে ভূত আর কেউ বলে শয়তান। প্রথমে ত' আমাদের কোনও কথাই কেউ বিশ্বাস করতে চান না। বিরক্ত হয়ে রাগ করে তাম্‌তিকে বল্‌লাম—"দেখা ত' রে চুনিগুলো।"

কোমরে হাত দিয়েই তাম্‌তি চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। বেল্ট থেকে চামড়ার থলেটা কখন কোথায় ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অরিন্দম বাবু মুচ্‌কি হাস্‌তে লাগ্‌লেন আর হায় হায় করে তাম্‌তি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়্‌ল। আমি বল্‌লাম—"যাক্ গে, কেঁদে আর কি হবে? কোট পেন্টুলুনের পকেটে কোথাও কিছু আছে কি না ছাখ্।"

অরিন্দম বাবু এতক্ষণ ঠোঁট টিপে অবিশ্বাসের হাসি হাসছিলেন, কিন্তু পকেট হাতড়ে এক মুঠো চুনি বের করে তাম্‌তি তাঁর চোখের সামনে ধরতেই দেখতে দেখতে তাঁর মুখের চেহারা বদ্‌লে গেল। তারপর ত জানোই। তাঁরই কাছে শুন্‌লাম সেটা মৌস্‌মাই ফল্‌স্। চেরাপুঞ্জি দেখতে গিয়েই বিপদ আরম্ভ হয়েছিল আর ঘুরে ফিরে সেই চেরাতেই এসে হাজির হলাম। অরিন্দমবাবু সঙ্গের চা কেক্ দিয়ে ভূরিভোজন করালেন, তাঁরই

গাড়ীতে আমি আর তাম্‌তি শিলঙ্ ফিরে এলাম। রাজার মতন খাতির করে তিনি দুজনকে আমাদের রাখলেন তাঁরই বাড়ীতে। খবরের কাগজে ছবি ছাপিয়ে, তোমাদের টেলিগ্রাম করে হৈ-হৈ লাগিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না—একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এসে পৌঁছে দিলেন তোমাদের কাছে, আবার যেন ফস্‌কে কোথাও না চলে যাই।

শিলু আর তাম্‌তিরাম যতগুলি চুনি এনেছিল তার মধ্যে থেকে বেছে বেছে অরিন্দম বাবুকে কতকগুলো উপহার দিলে। অরিন্দম বাবু নেবেন না কিছুতে, শিলুও নাছোড়বান্দা—শেষে শিলুরই জিৎ হল। তারপর পঁয়ষট্টিটা চুনির আংটি তৈরী করে শিলু পরতে দিলে সব্বাইকে। ছেলে-বুড়ো, বাচ্চা-কাচ্চা এমন কি ঠাকুর-চাকরও বাদ গেল না। বাকীগুলো বিক্রী হল অনেক টাকায়।

বিলাত থেকে শিলু নতুন আর একটা এরোপ্লেন আনিয়েছে তার নাম রেখেছে [illegible]।